Bangabandhu Sheikh M
Pathak Shamabesh
Since
1987
* 1 0 1 6 5 1 2 *
Tk. 120.00

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার বেবী মওদুদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার

বেবী মওদুদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার

বেবী মওদুদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. 98766
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

বর্ণবিন্যাস
ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
১০ হেমেন্দ্রে দাস রোড, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

BANGABANDHU SHEIKH MUJIB AND HIS FAMILY by Baby Maudud
Published by Afzal Hossan Anindya Prokash
30/1Ka Hemendra Das Road, Dhaka-1100. Phone 717 2966
email : anindyaprokash@yahoo.com
First Published in February 2010

Price : Taka 120.00
US $ 6

ISBN 978-984-414-227-5

উৎসর্গ

শেখ হাসিনা
শেখ রেহানা

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যখন আমরা প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্রী। সে পরিচয়সূত্রে তাঁর কাছে তাঁদের পরিবারের সকলের কথা শুনি। ধানমণ্ডিস্থ বত্রিশ নাম্বার বাড়িতে যাবার সুযোগ হয় এবং সবাইকে দেখি। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুব রহমান সপরিবারে নিহত হন। আমাদের সৌভাগ্য তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান এবং ঘাতকরা তাঁদের দেশে ফিরতে না-দেয়ায় বিদেশেই নির্বাসিত জীবন-যাপন করেন। তারপর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আমরা সকলেই জানি। বঙ্গবন্ধুর নাম ও ছবি মুছে ফেলা, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনা ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালায় সামরিক শাসকরা। কিন্তু যে বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর মুখ ও নাম ছিল শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় গাঁথা—তা কেউ মুছে ফেলতে পারেনি। বরং সেই নাম আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলার মানুষ তাঁর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছায়া দেখতে পায়। খুঁজে পায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চেতনা, সংগ্রাম ও জনদরদী মনের এক অনন্য সমন্বয়। নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে পারে। শেখ হাসিনা জীবনের ভয় না করে তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বৈর সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, গৃহবন্দি থেকেছেন, বোমা-গ্রেনেড ও বুলেটের মোকাবেলা করেছেন, মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় প্রায় একবছর নিঃসঙ্গ কারাগারে বন্দি থেকেছেন। এরপরও সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বীরের বেশে মুক্তিলাভ করেছেন এবং ২০০৮ সালে

জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা, তাঁদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমারও একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি এই সূত্র ধরেই বিভিন্ন সময়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং লেখার চেষ্টা করেছি। আমার সেইসব লেখা নিয়ে এই গ্রন্থ। আমার কাছে এই পরিবারের যে বন্ধনটি চোখে পড়ে তা অবশ্যই মানবিক। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর মা-বাবার কথা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা রেনুর স্মৃতি যখন তাঁর কন্যাদের কাছে শুনি তখন অবশ্যই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমান থেকে 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা' হয়ে ওঠার সেই আদর্শবাদী ও দুঃসাহসী মহামানবের কাহিনী ইতিহাসের সত্যকথা এবং এক রক্তাক্ত অধ্যায়। একটি শুদ্ধতম বাঙালি পরিবার, একটি প্রত্যন্ত অজ পাড়াগাঁয় তাঁদের বসবাস-জীবনযাপন এবং এই পরিবার থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান একটি জাতির জনক হয়ে উঠলেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে—বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন সফল হয়েছে।

আমার খুব সীমিত সুযোগ ও জ্ঞানে যতখানি সম্ভব তথ্যসংগ্রহ করে লেখার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থ পাঠক ও গবেষকদের গ্রহণযোগ্য হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। অনিন্দ্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেনের সদিচ্ছার কারণেই লেখাগুলো খুঁজে সংগ্রহ করে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছি। অনেক লেখাই পাইনি। তারপরও কোনো ভুলত্রুটি থাকলে আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

বেবী মওদুদ
১৯.০১.২০১০
ধানমণ্ডি, ঢাকা

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পারিবারিক জীবন/ ১১
ফজিলাতুন্নেছা মুজিব : শুদ্ধতম বাঙালি আদর্শের প্রতীক/ ১৬
একটি ফুলের মতো শিশু/ ২৩
১৫ আগস্ট ১৯৭৫/ ২৬
সেদিন ঢাকায় থাকলে এ রক্তাক্ত স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হত না/ ৩৬
শোকাবহ বেদনাতুর সেই স্মৃতি/ ৪২
আমার দেখা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর/ ৪৬
বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব/ ৫১
বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের তৈরি বঙ্গবন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত/ ৫৭
সংবাদপত্র-সাংবাদিক ও শেখ মুজিব/ ৬৪
বাঙালি বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব/ ৬৯
টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার/ ৭৫
বঙ্গবন্ধুর বোন শেখ আসিয়া খাতুন/ ৭৯
বঙ্গবন্ধুর জামাই : ড : এম. ওয়াজেদ মিয়া/ ৮৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পারিবারিক জীবন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ছিল সংগ্রাম-আন্দোলনে দীপ্ত। রাজবন্দি, রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা এবং ফাঁসির আসামি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় আকর্ষণীয়। জনগণের নেতা হয়ে ক্রমশ তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, টুঙ্গিপাড়া নামক এক অজপাড়াগাঁয় তাঁর জন্ম। গ্রামের ধূলিকণা-কাদামাটি-সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির ছায়ায়, মধুমতি নদীর বাতাস বুকে নিয়ে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর ঐ বড় হয়ে ওঠার সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাটা খুব ভালো ছিল না। বৃটিশ শাসকদের ঔপনিবেশিক শাসনে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা ছিল নিষ্পেষিত। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন যখন চলছিল, তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিব তখন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলস্বরূপ ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরের শাসনকালে বাঙালি জাতি হিসেবে বাংলার মানুষ বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দুঃসাহসী মরণজয়ী আন্দোলনের নেতৃত্বের ফলেই আমরা অর্জন করেছি আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাইরের কঠিন কঙ্করময় পথ ধরেই হাঁটতে হয়েছে, কুসুম-কোমল ছিল না তাঁর জীবনধারা। কঠিন অথচ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কলা-কৌশল নির্ধারণ, রাজনৈতিক ঝুটঝামেলা মেটানো, শক্তিশালী পাকিস্তানি সামরিক শাসকবর্গ ছিল তাঁর প্রতিপক্ষ, তাদের কলাকৌশলের পাল্টা আক্রমণ সংগঠন প্রভৃতি ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সহায়ক শক্তি ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। তাঁর প্রিয় দেশবাসী

জনগণ। আর ছিল বঙ্গবন্ধুর অনলবর্ষী ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর এই বিচিত্র রাজনৈতিক জীবনের অন্তরালে একটি পরম শান্তিময় পারিবারিক জীবন ছিল, যেখানে তাঁর মা-বাবা-ভাই-বোন এবং স্ত্রী ও সন্তানদের মমতা, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, স্নেহ তাঁকে সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখত। এ জীবনই তাঁকে জুগিয়েছে সাহস ও শক্তি, শিখিয়েছে আদর্শ নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ হতে। বঙ্গবন্ধুর উদার ও মানবিক হৃদয়টির উৎস ছিলেন তাঁর মা-বাবা ও স্ত্রী। শৈশব-কৈশোর থেকে এঁরাই ছিলেন তাঁর আজীবন সঙ্গী। এঁদের স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালোবাসায়, শিক্ষা-দীক্ষায় টুঙ্গিপাড়া গ্রামের 'শেখ মুজিবুর রহমান' যাঁর ডাক নামটি ছিল 'খোকা', তিনিই একটি জাতির জনক হয়ে ওঠেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন এন্ট্রান্স পাস। গোপালগঞ্জ কোর্টের নাজির ছিলেন তিনি। টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ছিল তাঁর বসতভিটা, কৃষিজমি ছিল। মোটামুটি মধ্যবিত্ত সচ্ছল পরিবার। বঙ্গবন্ধুর শৈশবজীবন কাটে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। পিতা চাকরি করতেন শহরে। বাড়িতে থাকতেন মা সাহারা খাতুন, বড়বোন ফাতেমা বেগম, আসিয়া বেগম, ছোটবোন আমেনা বেগম, ছোটভাই শেখ আবু নাসের ও ছোটবোন খোদেজা বেগম। এঁদের সঙ্গে থাকতেন তিনি। বড় দুবোনের অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যায়। আপন ভাই-বোন ছাড়াও আশ্রিত আত্মীয়স্বজনের পরিবারের ছেলেমেয়ের সঙ্গেও তাঁর জীবন কাটে। বাড়িতে ভোরবেলা মৌলভী সাহেবের কাছে কোরান শরিফ পড়তেন, গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস পড়তে হত। গ্রামের স্কুলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর গোপালগঞ্জ শহরের মিশন স্কুলে লেখাপড়া করেন।

ছোটবেলা থেকে মায়ের পরিচর্যায় শেখ মুজিবের জীবন কাটে। ছেলের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ মনোযোগ। খুব রোগা-পাতলা আর লম্বা শরীরের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর জন্য নিজহাতে দুধ থেকে মাখন তৈরি করে খাওয়াতেন। ভাতের সঙ্গে কৈ মাছ ছিল প্রিয়। মা নিজে রান্না করতেন। খাবার শেষে দুধ-আম দিয়ে ভাত খেতে ভালোবাসতেন। ছেলের খাবার তৈরি, পরনের পোশাক ঠিক রাখা, এসবই মা নিজের হাতে করতেন। খুব যত্ন করে কাঁথা সেলাই করতেন ছেলের জন্য। তার বিছানা ঠিক করা, বই-খাতা গুছিয়ে রাখা সবকিছুতেই ছিল মায়ের সতর্ক দৃষ্টি। বৃষ্টির দিনে ছেলেকে নতুন ছাতা বারবার কিনে দিতেও মা ক্লান্তিবোধ করতেন না। তাঁর খোকা বন্ধুবান্ধব ছাড়াও অন্য ছেলেদের নিজের ছাতাটি দিয়ে দিত, একথা শোনার পর মায়ের মনে গর্ব হত। খোকা

তার সব কথা প্রথম প্রথম মায়ের কাছে মুখ ফুটে বলত না। কিন্তু মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলে খোকা সব খুলে বলত। মায়ের গোলার ধান কত মানুষকে তিনি ডালাভরে দিয়েছেন। বাবা শুনতেন, কিন্তু খোকাকে কখনও বাধা দেননি। খোকা মনে দুঃখ পাবে, চোখের জল ফেলবে—এ কষ্ট তাঁরা দিতে পারতেন না খোকাকে। তাঁরা মনে করতেন, খোকা ভালো করেছে।

খোকা স্কুলে থাকতে গৃহশিক্ষক হামেদ মাস্টারের কাছে রাজনৈতিক কথা শোনে। তিনি নিজেই ছিলেন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সন্ত্রাসী দলের কর্মী। ফলে ছাত্র মুজিব স্কুলের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক শিক্ষার্জনেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে শেখ মুজিব সরাসরি ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবনে মা-বাবার পর স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা রেনুর বিরাট ভূমিকা ছিল। বিয়ের আগে বঙ্গবন্ধুর চাচাত বোন ছিলেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়সে মাতৃপিতৃহারা হলে মুজিবের মা তাকে ঘরে তুলে আনেন ছেলের বউ হিসেবে। শেখ মুজিবের বয়স তখন মাত্র বারো বছর। পরে আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয় বঙ্গবন্ধুর বয়স যখন আঠারো বছর। ছেলের প্রতি মায়ের মমত্ব ও পরিচর্যা ফজিলাতুন্নেছা খুব কাছে বসেই দেখেছিলেন। শাশুড়িও ছেলের উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মতন এমন বিরাট নেতার স্ত্রী হলে যে ব্যক্তিত্বময়ী হওয়া জরুরি, ফজিলাতুন্নেছা রেনু সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট-বেদনার উপলব্ধিতে সর্বজয়ী এক বিরাট আত্মত্যাগী নারী। শৈশব-কৈশোর থেকেই শেখ মুজিবের স্বভাব ও চরিত্রের দৃঢ়তা, চিন্তাভাবনা, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, মেজাজ-মর্জির সঙ্গে তিনি ভালোভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অসীম ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন বলে বিপদকে জয় করবার ক্ষমতা রাখতেন তিনি এবং পরিস্থিতি বুঝে চলবার এবং সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করবার চেষ্টা করতেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়েও হৃদয়বান এক স্বামী পেয়েছিলেন যাঁর প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ-মমতায় তিনি ছিলেন বিমুগ্ধ। স্বামীর প্রতি সাংসারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন জাতির জনকের যোগ্য স্ত্রী। একইভাবে একজন রাজনৈতিক নেতার সন্তানদের তিনি আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলেন।

বঙ্গবন্ধু কারাগারেই কাটিয়েছেন তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার আসামিও ছিলেন। ফাঁসির দড়ি ঝুলছিল তাঁর মাথার উপর। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারেও তিনি ছিলেন

রাষ্ট্রদ্রোহী আসামি। এতসব ঘটনার মুহূর্তগুলি ফজিলাতুন্নেছার কেমন করে কেটে যায় তা ভাবলে আশ্চর্য অনুভূতি জাগে। তিনি তো পত্রিকায় বিবৃতি দেননি, সভা করেননি, ভেঙেও পড়েননি। বরং একদিকে সন্তান-সংসার সামলেছেন, অপরদিকে স্বামীর সঙ্গে কারাগারে দেখা করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলেছেন, উকিলের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মামলা পরিচালনা করেছেন। এরপর তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, দলীয় রাজবন্দি নেতা-কর্মচারীদের স্ত্রীদের খোঁজখবর করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর যে কৃষিজমি পেয়েছিলেন তা শ্বশুর দেখাশুনা করতেন। জমির ধান-চালের হিসাব শ্বশুর তাঁর হাতে দিতেন। সে অর্থে সংসার চলেছে, মামলায় খরচ হয়েছে, ধানমণ্ডির বাড়ি তৈরিতে ব্যয় হয়েছে। অকারণে স্বামীর কাছে টাকা চেয়ে তিনি কখনও তাঁকে বিরক্ত করেননি। স্বামী বরং কারাগার থেকে চিঠিতে জানাতেন—'টাকা-পয়সা লাগলে আব্বাকে বলিও।'

বঙ্গবন্ধু কারাগার-জীবন থেকে ঘরে ফিরে এলে পরম শান্তিতে কয়েকটি দিন কাটাতে চেষ্টা করতেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দ করা, কারাগারের গল্প করা, আপন ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন এলে তাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব এসবই চলত। স্বামীর প্রিয় খাবার তৈরি, তাঁর বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা রাখা, এ সবকিছুর প্রতি ফজিলাতুন্নেছার সযত্ন দৃষ্টি থাকত।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু তাঁর অফিসের কাজকর্ম নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকতেন, বেগম মুজিব তাঁর দুপুরের টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে অনেক সময় নিজেই চলে যেতেন গণভবনে। টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে থাকতেন মা-বাবা। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব কখনও বাড়ি গেলে মায়ের হাতের দুধমাখা ভাত খাওয়ার লোভ ছাড়তেন না।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ও কঠিন সময়টি কেটেছে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনার আদর্শিক সঙ্গী ছিলেন তারা। পিতার জন্য শ্রদ্ধা-ভালোবাসা বুকে নিয়ে সন্তানরাও অপেক্ষা করেছে তিনি কখন সফল হবেন। স্বামীর উপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই বেগম মুজিব জানতেন, তিনি অবশ্যই তাঁর সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষা সফল করবেন। স্বামীকে প্রয়োজনে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছেন, যা আগামীদিনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তথ্য হয়ে সংযোজিত হবে। আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে তিনি যখন ক্যান্টনমেন্টে বন্দি, তাঁর দলীয় নেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে আইয়ুব

খানের গোলটেবিল বৈঠকে প্যারোলে যাবার গুজব ছড়ানো হয়, তখন বেগম মুজিব তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন,"তুমি যদি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যাও, তাহলে আমি পল্টনে জনসভা করব।" ১৯৭১-এর ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় যাবার আগে বেগম মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, "দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের নিরাশ কোরো না। যা বলার চিন্তাভাবনা করেই বলবে।"

বেগম মুজিব প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়তেন। কোথায় কী ঘটছে, কে কী বলছে সব পড়তেন। তাঁর নিজেরও ছিল বিচক্ষণক্ষমতা। সবদিক ভেবে তিনি নিজেই বিশ্লেষণ করতেন। একজন আদর্শ বাঙালি নারী হিসেবে নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করতেন কতটুকু তাঁকে যেতে হবে, কতটুকু তাঁর যাওয়া উচিত। তাই প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির স্ত্রী হিসেবেও তিনি সরল-সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। ধানমণ্ডির বাড়িতেই তিনি স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে শান্তিতে কাটিয়েছেন। সরকারি আরাম-আয়েশ, স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনের লোভ তাঁকে আকর্ষণ করেনি। ১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর রাষ্ট্রপতির স্ত্রী হিসেবে নিরাপত্তা, পিওন-আর্দালি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা হলেও তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, "আপনাদের রাষ্ট্রপতি এখনও মুক্ত হননি। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আমি এসব নিয়ে কী করব?"

কতবড় মাপের মানুষ ছিলেন বেগম মুজিব! জাতির জনকের স্ত্রীর তো জীবনের জন্য কোনো চাহিদা ছিল না, লোভ ছিল না। শুধু স্বামীর জন্য সবকিছু সয়ে গেলেন। এমনকি ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট একজন রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান ও জাতির জনকের স্ত্রী হবার কারণে তাঁকেও ঘাতকরা হত্যা করেছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯৯৬

ফজিলাতুন্নেছা মুজিব : শুদ্ধতম বাঙালি আদর্শের প্রতীক

আমরা কবির কণ্ঠে শুনেছি : 'রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী, রানীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।' আগেকার দিনে রাজা-বাদশাহদের আমলে এমন ঘটনার কথা আমরা শুনে থাকি। রাজ্য নিয়ে রাজনীতি, ক্ষমতা নিয়েই দ্বন্দ্ব, দম্ভ। জনগণের ভাগ্য নিয়ে কেউ কেউ থাকে নির্লিপ্ত, ভাঁওতাবাজি করে ঠকায়, নির্বিচারে অত্যাচার ও অনাচারে নির্যাতন চালিয়ে করে থাকে শোষণ। ফলে ক্ষমতাবানরাই হয় প্রভাবশালী ও বিত্তবান। জনগণের ভাগ্যে জোটে বঞ্চনা ও গ্লানি। কিন্তু কোনো কোনো রাজার দয়াবতী রানীর হৃদয়ের মহানুভবতা ও দূরদর্শিতার কাছে শাসক রাজাও পরাস্ত হয় এবং রানীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করায় রাজ্যের গ্লানিও দূর হয়ে থাকে।

আজকের বিশ্বরাজনীতি গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নির্বাচনই চূড়ান্ত করে দেয় ক্ষমতাধর কে হবে। আর এই ক্ষমতায় যাবার জন্য মানুষের দরদী নেতা হবার এত সংগ্রাম। কিন্তু সত্যকথাটা হল, প্রকৃত দরদী হিসেবে জনগণের নেতা হবার ভাগ্য সবার হয় না। এ বড় কঠিন পথ, কণ্টকাকীর্ণ পথ। এজন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী, আত্মত্যাগী, সাহস ও দূরদর্শী মেধার অধিকারী এক মানবিক হৃদয়সম্পন্ন নেতা—তিনিই কেবল পারেন জনগণের নেতা হতে। আমাদের পরম সৌভাগ্য বাঙালি জাতির কোলে জন্ম নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি জাতির জনক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন যুগ যুগ ধরে। 'যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'—কবির কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ উচ্চারণই তা প্রমাণ করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে, একটি জাতির জনক হয়ে ওঠা কিন্তু কম কথা নয়। অনেক বড় কথা। এর পেছনে রয়েছে নিজের ব্যক্তিজীবন, পরিবার-পরিজন (বিশেষ করে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান), আত্মীয়-স্বজন,

বন্ধু-বান্ধবসহ পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহকর্মীর অবদান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ব্রিটিশ শাসনামলে টুঙ্গিপাড়া নামে এক অজপাড়াগাঁয়। কৃষিপ্রধান এলাকা, নিম্নাঞ্চল হওয়ায় বন্যায় প্লাবিত হয়ে থাকে প্রতিবছর। দারিদ্র্য ও অনুন্নত জীবন-যাপন তখন বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে গ্রাস করে রেখেছিল। তারপরও শিক্ষার্জনে বাঙালি আগ্রহী হয়ে ওঠে। সংস্কৃতিচর্চায়ও গভীর আত্মনিবেদিত ছিল। ব্রিটিশ অধীন বাংলাদেশ ছিল ভারতবর্ষের একটি বড় অংশ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ ছিল সংগ্রামরত। তাঁদের দেশপ্রেম, আদর্শবাদ, সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ ছিল অভূতপূর্ব।

গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিব। চার বোন ও দুভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। গ্রামের প্রকৃতির আলো-হাওয়ায় তিনি বড় হয়ে ওঠেন, পারিবারিকভাবেও তাঁর প্রতি ছিল সকলের একটি সযত্ন দৃষ্টি। মা-বাবার স্নেহ, ভাই-বোনের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ তো বটেই, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী সকলের কাছেই তাঁর একটি ভিন্ন অবস্থান ছিল, যা জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত বজায় ছিল। বলা চলে একটি নিবিড় ঘনসম্পর্ক জড়িয়ে ছিল। বাড়ির সামনের মসজিদের ইমাম আবদুল হালিম সাহেব জুলাই ১৯৭৫ সালে তাঁর সঙ্গে ঢাকায় দেখা করতে এলে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করে পাশে বসান এবং তাঁর কাছে বিনীত কণ্ঠে সেদিন বলেছিলেন, 'আমার জানাজার নামাজ কিন্তু আপনি পড়াবেন।' শেষপর্যন্ত হালিম সাহেবই পড়াতে সমর্থ হন। একথা তিনি নিজেই আমার কাছে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন।

আমরা এখন আলোচনা করব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছার রেনুর কথা। একজন জাতির জনক হয়ে ওঠার পেছনে এই মহীয়সী নারীর অবদান আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে। ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন শেখ মুজিবের চাচাত বোন। তারা দু বোন ছিলেন, কোনো ভাই ছিল না। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তাদের দাদা শেখ কাশেম দু বোনের নামে জমিজমা ও বসতবাটি লিখে বিয়ে দিয়ে দেন। ফজিলাতুন্নেছার বয়স তখন মাত্র তিন বছর, শেখ মুজিবের তেরো বছর। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মা মারা গেলে মুজিবের স্নেহময়ী মা সাহারা খাতুন ছেলের বউকে কোলে তুলে নিজের

কাছে রেখেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লালন-পালন করেন। সেই সময় একান্নবর্তী পরিবারের প্রচলন ছিল। এছাড়া বাড়িতে আশ্রিত হিসেবে নিকট-আত্মীয়স্বজনদের অবস্থান ছিল। তাদের জন্য ধর্মশিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষার জন্য বাড়িতে শিক্ষক থাকতেন, আবার মেয়েদের সেলাই, রান্নাসহ গৃহস্থালির কাজকর্মও শিক্ষাও হত বাড়ির দাদি-নানি, মা-শাশুড়ির কাছে।

ফজিলাতুন্নেছার সৌভাগ্য হয়েছিল যে, শেখ মুজিবের মা ও বাবার অপত্য স্নেহের আশ্রয়ে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। শিশুবয়স থেকে স্বামীর স্বভাব, মেজাজ, আদর্শ ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন—তাই পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সহযোগিতা করতে সক্ষম হন অত্যন্ত শক্তহাতে, হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে ও এক অঙ্গীকারাবদ্ধ আত্মত্যাগের মহিমায়। ফজিলাতুন্নেছাকে একটু একটু করে গড়ে তোলেন শেখ মুজিবের মা সাহারা খাতুন। মাতৃপিতৃহারা এই শিশুটির হৃদয়জুড়ে ছিল এক অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার ভার। বিরাট এক সংসারে অনেকের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা গড়ে ওঠে। সেইসঙ্গে আত্মত্যাগের শুদ্ধতা তাঁকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। স্কুলে পড়তে যেতে পারেননি। ঘরে বসেই যে শিক্ষা অর্জন করেন, সেটাই তাঁর স্বাভাবিকত্ব। তরুণ বয়সে তিনি নিজেই পাড়ার মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন এবং নিজেই সেখানে শিক্ষা দিতেন—এটা আমরা বঙ্গবন্ধুর লেখা একটা চিঠি থেকে পাই। বই পড়তে ভালোবাসতেন তিনি, এটা তাঁর নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী ছিল।

শেখ মুজিব ১৯৪২ সালে যখন কলকাতায় লেখাপড়া করতে যান, তখন মাত্র বারো বছর বয়স ফজিলাতুন্নেছার। গ্রামের বাড়িতে শাশুড়ির কাছে থাকতেন। স্বামীর লেখাপড়ার জীবন ছাড়াও ছাত্ররাজনীতি, রাজনীতি, দেশসেবার কথা শোনেন। স্বামীর জীবনাদর্শও উপলব্ধি করতে শেখেন ধীরে ধীরে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে মা হলেন, তবে প্রথম পুত্রসন্তানটি জন্মের পরই মারা যায়। এরপর কন্যাসন্তান শেখ হাসিনার জন্ম হলে তিনি যেন সময় কাটানোর সঙ্গী পান। যতদিন বেঁচেছিলেন এই কন্যাসন্তানই তাঁর সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও আলাপ-আলোচনার একমাত্র সাথী ছিলেন।

ফজিলাতুন্নেছা অল্পবয়স থেকেই স্বামীর জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামীর স্নেহ-ভালোবাসায় ভরপুর এ মহীয়সী সর্বদা স্বামীর প্রতি উদারহস্ত ছিলেন। বিশেষ করে সে-যুগে মুসলমান-ঘরের মেয়েরা গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ডে সদা ব্যস্ত থাকতেন, দেশ ও সমাজ নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রশ্নই ছিল

না। ধর্মীয় অন্ধত্ব, সামাজিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বেড়াজালে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করতে হত। স্বামী বাড়িতে এলে তাঁর কাছেই শুনতেন তাঁর সকল কর্মকাণ্ড। এরপরও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল যে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি যেন লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যান। সে-কারণে প্রতিটি পরীক্ষার সময় তিনি কলকাতায় চলে যেতেন এবং বোনদের বাড়িতে থেকে স্বামীর লেখাপড়ার ও সেবাযত্নের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এমনকি রাজনীতি করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর পিতা-মাতা অর্থ দিলেও ফজিলাতুন্নেছাও আলাদা করে কিছু বরাদ্দ রাখতেন। বলা চলে, নিজের প্রতি সদা-উদাসীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনকে গুছিয়ে দেবার এমন নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল জীবনসঙ্গী হিসেবে ফজিলাতুন্নেছাই ছিলেন একমাত্র উপযুক্ত। আর তিনিই জীবনের সবরকম আনন্দ-সুখ-বিলাসিতা ও মোহ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকেও স্বামীর যোগ্য সঙ্গিনী হিসেবে তৈরি করতে সমর্থ হন।

ইংরেজরা ভারতবর্ষ ভাগ করে দিয়ে চলে যাবার পর ঢাকাকেন্দ্রিক বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। যে পাকিস্তানের জন্য তিনি এত আন্দোলন করেছিলেন, সেই পাকিস্তান সরকারই বাংলার মানুষের উপর শোষণের শাসন চালাতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নতুন করে রাজনৈতিক দল গঠন করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তুললেন। আর তার উপরই নেমে আসে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জেল-জুলুমের নির্যাতন। বাইরে থাকলে গোয়েন্দাদের তৎপরতা। এক শ্বাসরুদ্ধকর জীবন ছিল তাঁর। তখন বিচিত্র সব ছদ্মবেশে বিভিন্ন ধারায় যাতায়াত করতে হত তাঁকে। গোপন বৈঠক, কর্মীদের সংগঠিত করা, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি, নেতাদের বৈঠকে বসানো, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আন্দোলন পরিচালনা করা, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভাষা-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন, শ্রমিক-আন্দোলন, দাওয়ালদের আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলন—সর্বত্রই শেখ মুজিবের ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি। ভাষা-আন্দোলনের সময় কারাগারে একটানা অনশন করে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে ওঠেন। গ্রেফতার হয়ে কয়েকবার কারাবরণও করতে হয়েছে তাঁকে। নির্বাচনে বিজয়ী পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে বাংলার মানুষের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। আবার প্রাদেশিক মন্ত্রীও হয়েছেন দুবার। তারপর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবের প্রতি সব শাসকগোষ্ঠীর ছিল শ্যেনদৃষ্টি। কখনও ভারতের দালাল, কখনও দেশদ্রোহী, কখনও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করা হয়। কারাগারের নির্জন সেলে বসে তিনি হতাশায় নিরাশায়, আবার কখনও নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন।

এ সবকিছুর পেছনে তাঁর পিতার যেমন কল্যাণ কামনা ছিল তেমনি ফজিলাতুন্নেছারও বিরাট সাহসিকতাপূর্ণ অবদান ছিল। সেই পঞ্চাশের দশকে তিনি তিনটি শিশুসন্তানকে নিয়ে ঢাকা শহরে এসে বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন। স্বামী রাজনীতি করেন, তাই বাড়িভাড়া পাওয়াও ছিল কঠিন, ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাও ছিল কঠিন। তারপরও তিনি সামলেছেন ঘর-সংসার। এমন কঠিন সংগ্রাম ছিল তাঁর। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনকে মোকাবেলা করে সন্তানদের আদর্শবাদী হিসেবে মানুষ করে তোলেন। মায়ের মমত্ব তাঁর মধ্যে অপরিসীম ছিল। আবার রাজবন্দি স্বামীর মামলার তদারকি করতে আইনজীবীদের কাছেও ছুটেছেন। নিজের গহনা বিক্রি করে মামলা চালিয়েছেন। জমির ধান বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করেছেন।

ষাটের দশকে তো তাঁর ছিল বিপুল আত্মত্যাগ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি শেখ মুজিবের ফাঁসি হয়ে যাবে, সেসময় তিনি দলকে আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করছেন। ঘরে সভা করতে দিচ্ছেন, অর্থও যোগান দিচ্ছেন। সেসময় বেগম মুজিবকে সামরিক গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। বন্দি শেখ মুজিবকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দিতে তিনি কারাগারে সাক্ষাৎও করেছেন। ওই সময়ে একদল বিরোধী নেতার প্রস্তাব ছিল প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের। কিন্তু বেগম মুজিব এ খবর জানতে পেরে ত্বরিত গতিতে তাঁর কাছে পৌঁছে বলেন : 'তুমি যদি ওই নেতাদের কথায় প্যারোলে যাও তাহলে আমি পল্টন ময়দানে তোমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেব।' কী পরিমাণ সাহস ও দেশপ্রেম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আমরা সহজেই তা অনুমান করতে পারি।

আবার ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যেদিন ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিলেন. সেদিন যাবার আগে বেগম মুজিব তাঁকে একাকী বিশ্রাম করতে দেন। সেদিনও তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'সারা দেশের মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি তাদের নিরাশ করবে না। তোমার মনে

যা বলে তুমি তাই বলবে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণার প্রাথমিক পর্বটি সেরে ফেলেন অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে উচ্চারণ করে—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালাবাগ কারাগারে। সামরিক আদালতে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কারাগারে কবরও খুঁড়ে রাখা হয়। আর এদিকে বেগম মুজিব ও তাঁর সন্তানদের আত্মীয়বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আশ্রয় নিতে হয় এবং পরে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁদের গ্রেফতার করে ধানমণ্ডি ১৮ নং রোডের একটি বাড়িতে বন্দি করে রাখে। এই বন্দিজীবনেও দুঃসহ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তাঁকে।

তারপরও তিনি ধৈর্য হারাননি। একদিকে হাসপাতালে অসুস্থ শয্যাশায়ী শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা, সন্তানদের দেখাশোনা, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জ্যেষ্ঠাকন্যা শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান জয়ের জন্মলাভ, সৈন্যদের গঞ্জনা শোনা; অপরদিকে স্বামীর চিন্তায় মগ্ন—একটা অমানুষিক চাপ সহ্য করতে হয়েছে তাকে। দীর্ঘ নয়মাসে বন্দি অবস্থায় যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু ছিল অনিবার্য!

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরও তিনি গৃহের অন্তরালে থেকে শেখ মুজিবের সেবাযত্ন করেছেন, পাশাপাশি পারিবারিক কাজকর্মে দায়িত্বশীল ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁকে একবার অথবা দুবার ছাড়া কখনও দেখা যায়নি। ১৯৭২ সালে তিনি নারী পুনর্বাসন বোর্ডের কয়েকজন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন নিজে উদ্যোগী হয়ে। সমাজকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য-সহযোগিতায় তাঁর প্রচুর অবদান রয়েছে, কিন্তু কখনও তিনি প্রচার করতেন না। কখনও ভেঙে পড়তেন না। শান্ত স্বভাবের ছিলেন। বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা দিয়ে যে-কোনো বিপদের মোকাবেলা করতে পারতেন।

আজকের দিনে আমরা ফার্স্ট লেডি দেখি, শাসকদের স্ত্রীদের দেখি, তাদের প্রচার ও ব্যয়বহুল বিলাসিতাও দেখি রাজনৈতিক নেতাদের পরিবারে। সে হিসাবে বেগম মুজিব ছিলেন একেবারে দীনহীন এবং তুলনাবিহীন। আদর্শ বাঙালি পরিবারের স্ত্রী ও মা হিসেবে ছিলেন অনন্যা। আবার একজন দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ও জনগণমন অধিনায়ক রাজনৈতিক নেতার স্ত্রী হিসেবে ছিলেন উপযুক্ত সহকর্মী।

একটি জাতির জনক হিসেবে শেখ মুজিবের আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী, তেমনি শেখ মুজিবের আদর্শ স্ত্রী হিসেবে ফজিলাতুন্নেছাই ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য।

কী এক আশ্চর্য হৃদয়ের প্রেম ছিল তাঁদের, কী এক আশ্চর্য অনুভূতিসম্পন্ন জীবন ছিল তাঁদের, কী এক আশ্চর্য মানবিক শুদ্ধতম প্রতীক ছিলেন তাঁরা! জীবনে একত্রে ছিলেন 'দুজনে দুজনার তরে'। আবার মরণেও 'দুজনে এক হয়ে অমরতা' লাভ করলেন। আমাদের সৌভাগ্য আমরা তাদের দুজনকেই পেয়েছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য তাদের দুজনকে রক্ত দিয়ে জীবন দিতে হল বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য।

ইতিহাসের গবেষকরা একদিন নিশ্চয়ই যথাযথভাবে ফজিলাতুন্নেছার মূল্যায়ন করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

২০০৪

একটি ফুলের মতো শিশু

বঙ্গবন্ধু-পরিবারের ছোট্ট ছেলে শেখ রাসেলের জন্ম ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে। শেখ রেহানার জন্মের ৮ বছর পর তাঁর জন্ম হয়—আনন্দে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল সেদিন সারা বাড়ি।

বড় ভাইবোনরা যেন একটা সোনার পুতুল পেয়েছে। সবার কৌতূহল-আনন্দ ও উষ্ণতায় শেখ রাসেল সেদিন বড় বড় দু চোখ মেলে তাকিয়েছিল, ছোট্ট ছোট্ট মুষ্টিবদ্ধ হাত ও পা ছুড়েছিল আনন্দে, মুখভরা ছিল ফুলের মতো হাসি। পিতা শেখ মুজিব রাসেলকে মমতার চুমু খেয়ে অভিষিক্ত করলেন তাঁর বিশাল বক্ষে, তারপর উচ্চারণ করলেন—'ওর নাম হবে শেখ রাসেল।'

দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রিয়। ওই সময় রাসেলের একটি গ্রন্থ ছিল তাঁর কারাগারের প্রিয় সঙ্গী। আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ করে এবং রাজনৈতিক নেতাদের জেলখানায় বন্দি করে। রাজবন্দি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, মামলা জেল মুক্তি আবারো গ্রেপ্তার একের পর এক চলছিল।

১৯৬২ সালে কারামুক্তির পর তিনি সংগঠনকে শক্তিশালী করার পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করছিলেন খুব ধীরস্থিরভাবে। ওই সময় আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাড় দেয়।

১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে সম্মিলিত বিরোধীদলীয় প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী আইয়ুববিরোধী প্রচারণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাসায় এসে বিশ্রাম নেয়ার সময় পেতেন না। শেখ রাসেলের জন্ম হয়েছিল এমনি এক দিনে।

শেখ রাসেলের বয়েস যখন দুবছরও হয়নি বঙ্গবন্ধুকে আবারো রাজবন্দির জীবন যাপন করতে হয়। পিতার সান্নিধ্য, স্নেহ-মমতায় বড় হয়ে ওঠার সুযোগ হয়নি। একমাত্র মা ছিলেন তার সব আদর-আবদার,

ভালোবাসা-মমতার আধার, আর ভাইবোনদের ছিল চোখের মণি। কারাবন্দি পিতার জীবনযাপন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বাড়ির সবার ব্যস্ততার মাঝেও রাসেল একাকী বড় হয়ে উঠছিল। তার প্রিয় সঙ্গী ছিল সাইকেল, কবুতর ইত্যাদি।

১৯৬৯-এ বঙ্গবন্ধু কারামুক্ত হয়ে এসে কোলে তুলে নেন তাঁর চার বছরের পুত্র শেখ রাসেলকে। রাসেল এই প্রথম পিতাকে তার ইচ্ছামতো কাছে পেল।

এল সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ঘোষণা। রাষ্ট্রদ্রোহী বলে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পাকিস্তানের শাহীওয়াল কারাগারে আটক করে গোপন বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বাংলাদেশ তখন মুক্তিযুদ্ধে পাগলপারা, মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলাযুদ্ধের কৌশলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নাস্তানাবুদ হচ্ছে। ওই সময় রাসেল মা ও বোনদের সঙ্গে বন্দি হয়ে ছিল ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে। বড় দু ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। রাসেল মা-বোনদের সঙ্গে নিঃসঙ্গ হয়ে ঘরের ভেতর বন্দিজীবন কাটিয়েছে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরও তারা বন্দি ছিল। বাইরে তখন বিজয়-উৎসব চলছে। ১৭ ডিসেম্বর তারা বন্দিমুক্ত হলে রাসেল 'জয় বাংলা' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এলে সেদিন রাসেল পিতাকে বিস্ময়ভরা দুচোখে দেখেছে, তাঁর স্নেহচুম্বনে সিক্ত হয়েছে। এরপর থেকে সে খুব একটা পিতার সান্নিধ্য ছাড়া থাকতে চাইত না। যতক্ষণ পিতা কাছে থাকতেন, ততক্ষণ সে তাঁর কাছাকাছি থাকতে চাইত।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। ১০ বছরের রাসেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। চঞ্চল প্রকৃতির হলেও কখনো কখনো হঠাৎ সে শান্ত হয়ে নির্জনে প্রিয়সঙ্গী সাইকেল নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করত। তার আরো প্রিয় সঙ্গী ছিল ভাগ্নে জয়। তার সঙ্গে খুনসুটিও করত, আবার জয় না হলে তার চকোলেট খাওয়া হত না, খেলা করা হত না। আনন্দকে ভাগ করে নেয়ার উদারতায় রাসেল তার ক্লাসের বন্ধুদের খুব প্রিয় ছিল। সেই রাসেলের ঘুম ভেঙে যায় সেদিন গুলির শব্দে, হইচইতে। মা তাকে পেছনের দরজা দিয়ে কাজের লোকজনের হাতে নিচে পাঠিয়ে দেন।

১০ বছরের রাসেল হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখ নিয়ে সব দেখেছে, আর আতঙ্কভরা মন নিয়ে সবকটা গুলির শব্দ শুনেছে। তারপর ঘাতকেরা তার

হাত ধরে, অস্ত্র তাক করে। রাসেল কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, 'আমি মায়ের কাছে যাব। আমি মায়ের কাছে যাব।'

ঘাতক ওয়্যারলেসে অনুমতি নিয়েছে তাকে হত্যা করার। শেখ রাসেল, বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র—এই ছিল তার অপরাধ। ঘাতকরা তার হাত ধরে বড়ভাই শেখ কামাল, চাচা শেখ আবু নাসের, স্নেহময় পিতা শেখ মুজিব, মমতাময়ী মা, ভাই শেখ জামাল, সদ্যপরিণীতা ভাবী সুলতানা ও রোজী—সবার রক্তাক্ত দেহ দেখাল। রাসেল কেমন করে দেখেছিল সেই প্রাণহীন প্রিয়জনদের? সেই রক্তভেজা মেঝেতে হাঁটতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল কি হাহাকারে? রাসেলকে ঘাতকরা কেন এই রক্তাক্ত দেহগুলো দেখিয়েছিল? তার শুদ্ধতম ছোট্ট হৃদয়কে তারা কেন কষ্ট দিয়েছিল? কেন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করেছিল? ছোট্ট রাসেল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শেষবার উচ্চারণ করেছিল, 'আমাকে আমার হাসু আপার কাছে পাঠিয়ে দিন!'

ঘাতক—নরপিশাচ ঘাতকরা ছোট্ট রাসেলের সে কান্নাভেজা কথা শোনেনি, হৃদয়ের আকুতি শোনেনি। তারা বুলেটে বুলেটে শিশু রাসেলকে হত্যা করেছে। ছোট্ট রাসেল কাঁদতে কাঁদতে চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে গেছে।

আমরা রাসেল হত্যার বিচার চাই। আমরা শিশু রাসেল হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড চাই। একটি ফুলের মতো শিশুকে যারা বাঁচতে দেয়নি তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। অপরাধীকে করুণা করা পাপ। আমরা বাংলাদেশকে পাপ ও পাপীদের হাত থেকে মুক্ত করতে চাই যেন আগামী দিনের শিশুরা উজ্জ্বল আনন্দ স্বাস্থ্য শিক্ষা পরমায়ু নিয়ে গড়ে ওঠে। এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমরা।

ছোটদের কাগজ
১৯৯৬

১৫ আগস্ট ১৯৭৫

শুক্রবার। ২৯ শ্রাবণ ১৩৮২। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল। ফজরের আযান শুরু হয়েছে মাত্র। রাতের অন্ধকারের শেষ রেশটুকু ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। শ্রাবণের শেষ দিন, বাতাস ভেজা ছিল। গাছের পাতায় পাতায় মৃদু শব্দ তুলছিল সে বাতাস।

ধানমণ্ডি ৩২ নং সড়কে হঠাৎ সামরিক জিপ ট্যাংক ও ভারী ট্রাকের ছোটাছুটি শুনা গেল। তারপর গুলি আর গুলি, শুধু গুলির শব্দ। আশপাশের বাড়িগুলো সে শব্দে সচকিত হয়ে উঠে, কান ভারী হয়ে উঠে। মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় দেখা দিল, এমন গুলি তো এখন আর হবার কথা নয়! ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে একবার শোনা গিয়েছিল। এখন আবার কেন? যাদের একাত্তরের অভিজ্ঞতা ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে রেডিও খুলে বসে। ঠিক তখুনি কিছু শোনা যায়নি। শোনা গেল আরও পরে। মেজর ডালিম কর্কশকণ্ঠে বিকৃত বাংলায় ঘোষণা করল : শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ৩২নং বাড়ি প্রথমে ঘিরে ফেলা হয়। গেটের রক্ষীরা প্রতিরোধ করতে উদ্যত হলে তাদের থামানো হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল খবর পেয়ে ৩২ নম্বরে এলে তাঁকে রাস্তার উপর গুলি করে হত্যা করা হয়। দোতলায় ততক্ষণে খবর চলে গেছে। বাড়ির সবাই জেগে উঠে দোতলায় এসেছে। টেলিফান বেজে উঠল দুবার। বঙ্গবন্ধু নিজেও দুবার টেলিফোন করলেন। বড়ছেলে শেখ কামাল ঘুমভাঙা চোখ নিয়ে নিচে নেমে এলে তাকেও অফিসঘরের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়।

প্রথমেই খুনিদের একটি দল নিচতলার প্রতিটি ঘরে ঢুকে গুলি চালায়। বসার ঘরের আলমারি ও ছবিতে গুলি করে। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লাইব্রেরির বইয়ের আলমারিতে গুলি করে। কার্ল মার্কস ও অনেক বইয়ের ভেতর এখনও গুলির ফুটোর চিহ্ন আছে। বুলেটও বিঁধে আছে, আলমারির ভাঙা

কাচও আছে। লাইব্রেরির পাশের কক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছোটভাই শেখ নাসের, যিনি পাঁচদিন আগে এসেছেন, তাকেও গুলি করে হত্যা করে। এরপর নিচতলায় খাবারঘরে ঢোকে। রান্নাঘরে ঢোকে। তারা বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল, অস্থির তৎপর ছিল। কাজের লোকজনদের কেউ পালাল, কেউ দোতলায় গেল, কেউ ভয়ে মাটিতে বসে কাঁদতে লাগল।

ঘাতকদের একজন দোতলায় ওঠা সিঁড়ির প্রথম ধাপ পেরিয়ে দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়াল। বঙ্গবন্ধু লুঙ্গির উপর শাদা পাঞ্জাবি চাপিয়ে সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, 'কী ব্যাপার? এত গুলি কেন? কী হয়েছে? তোমাদের অফিসার কোথায়?' নির্দেশ হয়তো ছিল বঙ্গবন্ধুকে দেখামাত্র গুলি করার, কিন্তু সে করতে পারল না। অস্ত্র তুলেই নামিয়ে নিল। ঐ বিশাল ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তি তাকে কি আচ্ছন্ন করেছিল? বলল, 'স্যার, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' বঙ্গবন্ধু প্রশ্ন করলেন, 'কেন? কোথায় যেতে হবে?'

হাত দিয়ে তাঁকে সরিয়ে আরেকজন অস্ত্র তুলল। তারপর একটানা গুলি, গুলি শুধু গুলিই। বঙ্গবন্ধু পড়ে গেলেন লম্বা হয়ে সিঁড়িতেই। বেগম মুজিব চলে এসেছিলেন তাঁর পেছনে পেছনে, বঙ্গবন্ধু তাঁকে ভেতরে যেতে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কাজের ছেলে আবদুলও সেদিন বুলেটবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়, আহত অবস্থায় সে ঘাতকদের দেখে, তাদের উল্লাস ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শোনে। ঘাতকরা চলে গেলে সে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বের হয়ে যায়। আবদুল এখনও সে স্মৃতি মনে করে শিউরে ওঠে।

এরপর খুনিরা বঙ্গবন্ধুর লাশ টপকে ভেতরে ঢুকে শোবার ঘরে দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাকুল বেগম মুজিবকে গুলি করে হত্যা করে। বাথরুম থেকে টেনে বের করে এনে বাকি সবাইকে গুলি করে। নিচতলায় রাসেলকে কাজের লোকেরা আগেই নিয়ে গিয়েছিল। রাসেল কাঁদছিল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছিল, 'মার কাছে যাব। আমি মার কাছে যাব।' সৈন্যরা তাকে সবকটি লাশের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে মায়ের কাছে এনে গুলি করে হত্যা করে।

কারফিউ জারি থাকায় সেদিন পথঘাট ছিল জনশূন্য। খবরের কাগজ ছাপা হলেও বিক্রি হয়নি। বাজার বসেনি। দোকানপাট খোলেনি। অফিস-আদালতও হয়নি। বড় রাস্তাগুলোতে সেনা জিপ, ট্যাংক ও ট্রাক, কিছু সরকারি গাড়ি চলাচল করেছে। সৈন্যদের প্রহরায় রেডিওর সামনে ট্যাংকটা অনেকদিন ছিল। সকাল ৬টায় রেডিও থেকে বারবার মেজর ডালিম ঘোষণা

করছিল যে, 'শেখ মুজিব খুন হয়েছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সামরিক আইন জারি হয়েছে।' সামরিক আইনের বিধিনিষেধ প্রচার হচ্ছিল। আর কাজী নজরুল ইসলামের 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' গানটির যন্ত্রসংগীত বাজানো হচ্ছিল। খবরে জানা গেল, খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়েছে। সন্ধ্যায়ও টিভিতে একই খবর। সামরিক আইনের বিধিনিষেধ জারি ও প্রচার করা হয়। সংগীত বাজানো হয়। সেদিন বিদেশী বেতারের খবরে এ সংবাদটিই প্রধান ছিল। সন্ধ্যায় বিবিসি এ সংবাদ প্রথম প্রচার করে। তবে ভোয়া ভোর ৬ টায়ই প্রথম সংবাদটি প্রচার করতে সমর্থ হয়। এই মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের খবর পূর্ণাঙ্গ না দিতে পারলেও সে মুহূর্তে বিভিন্ন দেশ বঙ্গবন্ধুর কথা উদাত্তভাবে প্রচার করছিল।

ঢাকায় বিকেলের মধ্যে ছড়িয়ে গেল যে বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা এবং রোজী, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের ও কর্নেল জামিল ৩২ নম্বরে নিহত হয়েছে। মিন্টু রোডে কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী, এক পুত্র আরিফ, নাতি বাবু ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারা হয়। বাড়ির কয়েকজন কাজের লোক ও পুলিশকেও ঘাতকরা হত্যা করে। তাঁর স্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সেজোবোন আমেনা বেগম ও মেয়ে বুলেটবিদ্ধ হন। তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়। ধানমণ্ডিতে শেখ মলি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ঘরে ঢুকে গুলি করে মারা হয়। তাঁর দুই শিশুপুত্র খাটের তলায় লুকিয়ে রক্ষা পায়।

বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ সেদিন ৩২ নম্বরে ছিল। তবে তা ছিল সৈন্যদের কঠোর পাহারায়। অন্য বাড়ির লাশগুলো এনে এ-বাড়ির লাশগুলোর সঙ্গে একত্রে রাখা হয়। রাতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় লাশ কীভাবে দাফন করা হবে। অনেক রাতে গোসল ও জানাজা ছাড়া সব লাশ বনানীতে দাফন করা হয়। টুঙ্গিপাড়ার ওসিকে খবর পাঠানো হয়, পরদিন লাশ যাবে সুতরাং কবর যেন খনন করা থাকে।

রাতে বঙ্গবন্ধুর লাশ বরফ দিয়ে ৩২ নম্বরে রাখা হয়। সারারাত দুশ্চিন্তা নিয়ে কঠোর সতর্কতার সঙ্গে তা পাহারায় রাখে একদল সৈন্য। লে. ক. আবদুল হামিদকে দায়িত্ব দেয়া হয় হেলিকপ্টারে করে লাশ টুঙ্গিপাড়া নিয়ে গিয়ে দ্রুত দাফন করে, কবর পাহারায় রেখে চলে আসার জন্য। সকালে লাশ বহনের জন্য বাক্স এনে তাতে আবার বরফ দিয়ে সম্পূর্ণ লাশ মুড়ে নিয়ে সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায়। শনিবার দিনও ঢাকা শহর ছিল থমথমে।

সকালেই টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি নূরুল আলম চৌধুরী সাহেব বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মসজিদের ইমাম মৌলভী আবদুল হালিমের কাছে খবর দিলেন লাশ আসছে। সুতরাং কবর যেন খুঁড়ে রাখা হয়। ইমাম সাহেব আগের দিন দুপুরেই এই হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে শোকাহত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেওছিলেন তাঁকে শেষ সাক্ষাতের সময় : 'আমার জানাজা আপানাকেই পড়াতে হবে।'

বাড়ির সামনে বঙ্গবন্ধুর স্নেহময় পিতামাতার মাজারে শাদা মার্বেলসেট বসানোর কাজ করছিল মিস্ত্রিরা। বঙ্গবন্ধুই এ পাথর সেট করানোর কাজ করাচ্ছিলেন। এ পাথর তিনি নিজে পছন্দ করে কিনে পাঠান। ইমাম সাহেব মিস্ত্রি আলী আসগর মিয়ার সাহায্যে দুটো কবর খনন করে রাখলেন বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের জন্য। ১২টা বেজে গেলে তিনি ঘরে গিয়ে গোসল সেরে নামাজ পড়ে এলেন।

বেলা দেড়টায় একটা হেলিকপ্টার এল। বাড়ির কাছে থানার পাশে মাঠে নামল। প্যাকিং করে বরফঢাকা লাশ-বহনের খাট নামানো হল। লে. ক. হামিদের নেতৃত্বে মোট ১২ জন সৈন্য কফিন বয়ে আনল। চারদিকে খুব কড়া নিরাপত্তার পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। পুরো টুঙ্গিপাড়ায় কারফিউ জারি ছিল। জনগণকে একেবারে আসতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর দুই মামাশ্বশুর শেখ মনসুরুল হক ও শেখ মনজুরুল হক কফিন বুঝে নিলেন। বাড়ির লোকজন আগেই সরে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মেজোচাচি ও ছোটচাচি লাশ দেখার অনুমতি পেলেন। লাশ থেকে বরফ সরানো হল, বরফগলা পানির সঙ্গে রক্তও গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে। দুই চাচির কান্নায়, শোকের কোনো সীমা ছিল না। একটা ময়লা শাদা মার্কিন চাদরে লাশটা ঢাকা ছিল। বরফে তা ভিজে যায়। বঙ্গবন্ধুর পরনে ছিল শাদা গেঞ্জি, পাঞ্জাবি ও শাদা-কালো চেক লুঙ্গি। পাঞ্জাবির পকেটে চশমা ছিল, সারা শরীর রক্তাক্ত।

ইমাম সাহেবকে দ্রুত লাশ দাফন করতে বলল লে. ক. হামিদ। লাশ দেখার পর ইমাম সাহেব বললেন, দুঘণ্টা সময় লাগবে। ক. হামিদ বললেন, কেন? ইমাম সাহেব বললেন : 'শরিয়ত অনুযায়ী গোসল করাতে ও জানাজা পড়াতে সময় লাগবে।' ক. হামিদ এসব ছাড়াই করা যায় কি না বলতেই ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন 'একজন মুসলমানের লাশ গোসল ছাড়াই দাফন করা যায়, যদি সে শহীদ হয়।' হামিদ তখন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'আপনি দাফন করবেন কি-না?'

: 'না, পারব না। যদি লিখে দিন যে শহীদ করে এনেছেন তাহলে পারি।' ইমাম সাহেবের বুক জুড়ে যে শোকাহত কান্না, তা তাঁকে শক্তিশালী করেছিল।

: না, সেটা লিখতে পারব না। ঠিক আছে গোসল করান, তবে দেরি করতে পারবেন না।

কর্নেল খুব টেনশনে ছিলেন। সৈন্য ও পুলিশদের বারবার সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকেন। নিহত বঙ্গবন্ধুর লাশ ঘিরেই থাকল সেই ১২ জন সৈন্য।

৫৭০ সাবান দিয়ে বঙ্গবন্ধুর যাথারীতি গোসল করানো হল। রেডক্রস থেকে চার ইঞ্চি পাড়ের শাদা শাড়ি এনে পাড় ছিঁড়ে ফেলে কাফনের কাপড় বানানো হল। একটা গুলি মাথার পেছনে করা হয়েছিল। নয়টা গুলি চক্রাকারে বুকের নিচে করা হয়। পায়ের রগ কাটা ছিল, একটা আঙুলে গুলি লাগে।

খুব দ্রুত লাশ দাফন হয়ে গেল। উপরে মাটি চাপা দিয়ে, উঠোনের বরই গাছের কাঁটাভরা ডাল চাপানো হল। হেলিকপ্টার চলে যাবার আগে বাইগার নদীর পানিতে রক্ত ধুয়ে টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে ফেলে যায়।

কবর পাহারার ব্যবস্থা হল। বাড়িতে দরজা-জানালা সিল করে রেখে সৈন্য পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হল। বঙ্গবন্ধুর পিতাকে দেখাশুনা করার জন্য নির্মল নামের যে ছেলেটি সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল, সেই নির্মল শুধু কান্নাকাটি করে পড়ে রইল। বঙ্গবন্ধুর কোনো আত্মীয় বা গ্রামের লোকজনদের কবরের কাছে যেতে দেয়া হত না।

বঙ্গবন্ধুর ছোটভাই শেখ নাসেরের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুলনায় ছিলেন। বুধবার দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বাচ্চাদের নিয়ে চলে এসো।' শেখ নাসেরের স্ত্রী তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনেই তিনি খুলনায় মায়ের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। তাদের খুলনার বাড়িও সিল করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নেয়া হচ্ছে খবর পেয়ে তিনিও সেখানে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু আশপাশে সব থানা পুলিশ সতর্ক ছিল, কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় বাড়ির পেছনের খাল থেকেই তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন। এসময় মোল্লারহাটের থানার ওসি তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছিলেন। ১৬ আগস্ট তিনি লঞ্চে কাটান। কারফিউ থাকায় কোথাও নামতে পারেননি। খুলনার বাড়ি ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সিল করা থাকে। এপ্রিল মাসে

তিনি টুঙ্গিপাড়া গিয়ে মাজারের চারপাশ বাঁশের ভাঙা খুঁটি দেখতে পান। এটা বঙ্গবন্ধুর ফুপাত ভাইয়ের ছেলে নজীব অনেক কষ্টে দিয়ে যায়। আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিজে সব পরিষ্কার করান এবং ইটের গাঁথুনি দেন। তার চারপাশে বাঁশের বেড়া দেন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি প্রতিবছর এই দিনে টুঙ্গিপাড়া নিজে গিয়ে দেখাশোনা করেন। মিলাদ পড়ান।

বঙ্গবন্ধুকে মাটি চাপা দিয়ে বরই গাছের ডাল চাপ দিয়ে রাখা হয় প্রায় দুবছর। চারপাশে তিন চটার বাঁশের খুঁটি পোঁতা ছিল। মাথার কাছে একটা হাসনাহেনা, পায়ের কাছে একটা নারকেল গাছ—এই ছিল একমাত্র নিঃসঙ্গ অথচ প্রাণময় সঙ্গী। আর মধুমতি নদী থেকে আসা ভেজা বাতাস। পাশেই বাবা-মার মাজার। সামনের রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে যে-কেউ কবরের দিকে একবার থমকে তাকিয়ে না-দাঁড়িয়ে যেন দোয়া-দরুদ পড়ত মনে মনে। মাজারে ফুলও দেখা যেত। এত কঠিন পাহারায় কীভাবে ফুল আসত, কোথা থেকে ঐসব ফুল আসত কেউ বলতে পারে না। কোটালিপাড়ার সিকান্দার পাগলা নামে এক ব্যক্তি প্রায় দুবছর পর্যন্ত এখানে ছিল। সে-ই চিৎকার করে বঙ্গবন্ধুর কথা বলত।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সময় বঙ্গবন্ধুর দুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানি ছিলেন। শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া পশ্চিম জার্মানিতে একটি উচ্চতর বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়ন করতে যান। ৩০ জুলাই শেখ হাসিনা ছেলেমেয়ে ও ছোটবোন রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে যান। যাবার সময় পিতার নিরাপত্তার কথা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। সেবার তাঁর মা বিমানবন্দরে বিদায় জানাবার সময় তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিলেন। তাঁকে ওভাবে কাঁদতে দেখে হাসিনা একসময় বলেছিলেন, "তুমি এভাবে কাঁদলে আমি যেতে পারব না মা।" সে কান্নার স্মৃতি আজও শেখ হাসিনা ও রেহানাকে ভারাক্রান্ত করে রাখে।

রেহানা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বোনের সঙ্গে বেড়াতে যান। ঐ সময় তারা ব্রাসেলসে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট রেহানা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ঢাকায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি জানান যে,রাষ্ট্রদূতকে খবর দেবেন সব ব্যবস্থা নিতে।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খবর জার্মান রাষ্ট্রদূত তাদের জানান। দূতাবাসে থেকে ড. ওয়াজেদকে অবিলম্বে বন ফিরতে বলা হয়। বনে ফিরে শেখ হাসিনাকে জানানো হল, বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। শেখ হাসিনা শুধু বললেন, 'কেউ কি বেঁচে নেই?' পরে তারা

ভারতে আসার সময় প্লেনে কাগজ পড়ে জানতে পারেন কে কীভাবে নিহত হয়েছেন। বাবা, মা, ভাইহারা দুবোন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন। সান্ত্বনা দেবারও কেউ ছিল না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেদিন সকালে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে যাবার সময় সংবাদটা পান এবং হতবাক হয়ে যান। তাঁরা শোকাচ্ছন্ন ছিলেন সারাদিন। ঢাকা রেডিও থেকে তখন শুধু বঙ্গবন্ধুবিরোধী কথা ও গান প্রচার করা হত। খান আতাউর রহমান ঐসব গানের রচয়িতা ও সংগীত-পরিচালক ছিলেন। দেশজুড়ে সব মানুষকে শুধু কাজ করার কথা বলা হত। গুলিস্তান বঙ্গভবন প্রভৃতি বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাংক ও সৈন্যরা দীর্ঘদিন মোতায়েন ছিল। কারফিউ জারি হত সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সারা শহর থাকত স্তব্ধ। শোকাহত বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা একে একে বিনষ্ট হতে থাকল।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খুনি মুশতাক কুখ্যাত অধ্যাদেশ জারি করল যে, এই হত্যার কোনো বিচার হবে না। অধ্যাদেশটি প্রকাশিত হল গেজেটে :

1. *Short title*—This ordinance may be called the Indemnity Ordinance 1975.
2. Restrictions on the taking of any legal or other proceedings against persons in respect of certain acts and things—(1) not withstanding anything contained in any law, including law relating to any defence service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings, legal or disciplinary, shall lie, or be taken, in, before or by any court, including the Supereme Court and Court Martial, or other authority against any person, including a person who is or has, at any time, been subjected to any law relating to any defence service, for or on account of or in respect of any act, matter or things done or step taken by such person in connection with, necessary step towards, the change of Government of the People`s Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the Morning of the 15th August, 1975.
3. For the purposes of this section or certificate by the President, or a person authorised by him on this behalf, that any act, matter or thing was done or step taken by any person mentioned in the certificate in connection with or in

perparation or execution of any plan for, or as necessanry step towards the change of the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August 1975 shall be sufficient evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in connection with or in prepararion of execution of any plan for, or as necessary step towards, the change of the Government and the proclamation of Martial law on that morning.

জেনারেল জিয়া এই অধ্যাদেশ সংবিধানের ৪র্থ তফশিল ৩ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত করে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার যাতে না হয় সে-ব্যবস্থা মজবুত করে। এ এক কলঙ্কিত ইতিহাস।

১৯৭৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে কর্নেল ওসমানী সম্মিলিত বিরোধী জোটের প্রার্থী মনোনীত হলে সেবারই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করেন।

১৯৮১ সালের ১৭ মে এক বর্ষমুখর দুপুরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে লাখ লাখ ছাত্র-জনতা-কর্মী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁকে বিমানবন্দরে সংবর্ধনা জানান। শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ৩৩ বছর বয়স্কা তরুণী কন্যা সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, "আমার রাজনীতি হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের আন্দোলন চলবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, সেনাশাসনের বিরুদ্ধে, যার দুঃশাসনের ফলে দেশে আজ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নস্যাৎ করা হয়েছে।"

১৮ মে টুঙ্গিপাড়ার বাড়ি পুলিশরা ছেড়ে চলে যায়। সৈন্যরা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯ মে শেখ হাসিনা লঞ্চযোগে ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়া যান। সেদিন তাঁর ১০৩ ডিগ্রি জ্বর ছিল। বাবা, মা, ভাই, বোন ও আত্মীয়স্বজন হারানো শোক ছিল আবেগাপ্লুত গভীরতাপূর্ণ। পরবর্তীতে সেই শোক তাঁকে শক্তিশালী ও সাহসী করেছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারী ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত সদম্ভে শাসন করেছে। খন্দকার মোশতাক ছিল রাষ্ট্রপতি। একটি মন্ত্রিসভা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর খবর দেশ-বিদেশে মিথ্যা ও বিকৃতভাবে প্রচারিত হয়েছে। দুদিন আগে যেসব পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর গুণগান গেয়েছে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে।

জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিদেশে দূতাবাসের বিভিন্ন চাকরিতে পুনর্বাসিত করে। খন্দকার মোশতাকের মামলা চলে। রাজনীতি বন্ধ থাকে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী কর্নেল ফারুক, রশীদ পরে বিদেশে পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে তাদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরাই ছিল এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যারা মেনে নিতে পারেনি, তারাই সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। জে. এরশাদ বঙ্গবন্ধু-হত্যাকারীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছে। জে. জিয়ার মতো সেও মুক্তিযুদ্ধের রাজাকার-দালালদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে মন্ত্রী বানিয়ে।

জানা যায়, নিহত হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর বেশিরভাগ সময় কেটেছে সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততায়। গণভবনে যাওয়া, ফাইলপত্র দেখা ও সাক্ষাৎকার সবই ছিল, এরপরও তিনি গভীর চিন্তামগ্ন থাকতেন। ৯ আগস্ট আবু সাঈদ চৌধুরী মন্ত্রীপদে শপথ গ্রহণ করেন। ১০ আগস্ট চালনা-বন্দর শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের আদেশে স্বাক্ষর দান, বন্দর-শ্রমিকদের মজুরি ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। ১১ আগস্ট ছোটবোনের মেয়ের বিয়েতে যান। ১২ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বেলগ্রেড সফরে গেলে তাঁর হাতে প্রেসিডেন্ট টিটোকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। ১৪ আগস্ট কোরীয় প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত মি. সোয়ান চু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ছবিটি সম্ভবত তাঁর সর্বশেষ সরকারি ছবি। ১৫ আগস্ট সকাল ৯টায় তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে যাবার কথা ছিল। ১৬ আগস্ট বাকশাল জেলা-নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষে জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। অবশ্য সেদিনের কাগজ পাঠকের হাতে পৌঁছায়নি। ১৬ আগস্ট পত্রিকা প্রকাশিত হলেও বিলি করা হয়নি। ১৭ আগস্ট ৪ পৃষ্ঠার কাগজ প্রকাশিত হয়। এদিন বাসস পরিবেশিত খবরে বলা হয় : 'পূর্ণ মর্যাদায় পরলোকগত রাষ্ট্রপতির দাফন সম্পন্ন' (হেডিং)। খবরটি হল : 'পরলোকগত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ গতকাল (শনিবার) বিমানে করিয়া তাহার নিজ গ্রামে টুঙ্গিপাড়ায় (ফরিদপুর) লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহাদের পারিবারিক গোরস্থানে পূর্ণ মর্যাদায় দাফন করা হয়। একজন সরকারী মুখপাত্রের বরাত দিয়া বাসস এ খবর জানাইয়াছে।' *(দৈনিক ইত্তেফাক)।*

বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন বুধবার ৪ চৈত্র ১৩২৬, ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে। আজীবন দেশ ও জনগণের কথা ভেবেছেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেছেন, জেল-জুলুম ছিল চিরসঙ্গী, 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা নিয়ে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছেছেন, পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে নির্জন কারাগারে বন্দি রেখে গোপন বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তাঁকে জাতির জনকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করা এবং শহীদ পরিবার ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাসহ কোটি মানুষকে পুনর্বাসিত করে যখন তিনি দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনই ঘাতকদের দল তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করল। শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিব বাঙালি-বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক অভিন্ন সত্য, শুদ্ধতম মানবিক।

টুঙ্গিপাড়ার বাড়ির সামনের আঙিনায় পূর্ব-দক্ষিণ খোলা আকাশের নিচে প্রায় ২০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বঙ্গবন্ধুর মাজার। লম্বায় ১০ ফুট, পাশে ৫ ফুট। ১৯৮৮ সালে ১৫ আগস্টের পর শেখ হাসিনা মাজারটির সংস্কার করান। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাবা-মার কবর বাঁধানোর জন্য যে শাদা পাথর কিনেছিলেন, তার বেশকিছু টুকরো বেঁচে যায়। শেখ হাসিনা সেগুলো দিয়েই মাজারে পাথরসেট করিয়ে নেন। কবরের উপরের অংশে খোলা সবুজ ঘন ঘাস ও ফুলগাছ লাগানো আছে। মাজারের চারপাশে গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সারারাত বিদ্যুতের বাতি জ্বলে একটা। ফুল ও ফলগাছ লাগানো আছে মাজারের চারদিকে।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের মাজার জিয়ারত করতে প্রতিদিন মানুষ আসে। ১৫ আগস্ট হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। দূরদূরান্ত থেকেও মানুষ আসে। শিরিষ-কদম-নিম-নারকেল-তাল-তমাল-বকুল গাছের নিভৃত ছায়ায়, সবুজ প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় বঙ্গবন্ধুর মাজার। মধুমতির ভেজা বাতাস তাঁর বড় প্রিয় ছিল। যে মাটিতে তাঁর জন্ম, যাঁর স্নেহ-মমতা মেখে তিনি বড় হয়েছেন, যে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পরিপুষ্ট করে তাঁকে দেশ ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে; সে মাটিতেই তাঁর রক্তাক্ত দেহ আজ শায়িত, সমাহিত।

রচনাকাল : ১৯৯১

সেদিন ঢাকায় থাকলে এ রক্তাক্ত স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হত না

শুক্রবার ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই নববিবাহিতা পুত্রবধূসহ ঘাতকদের বুলেটে নিহত হলেও তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রাণে বেঁচে যান। শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া, পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও বেঁচে যান। কারণ তাঁরা তখন দেশে ছিলেন না। ড. ওয়াজেদ একটি শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে স্ত্রী ও দু'সন্তানসহ জার্মানিতে ছিলেন। শেখ রেহানা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী থাকায় বেগম মুজিব তাঁকেও বড়বোনের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন কিছুদিন থাকার জন্য। শেখ কামাল ও শেখ জামালের বিয়ের পর জুলাই মাসের ৩০ তারিখে তাঁরা জার্মানি যান।

শেখ হাসিনা আমার কাছে বলেছেন, "আমাদের যাবার দিন মা খুব কাঁদছিলেন। এমনভাবে মাকে আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি। বিমানবন্দরে আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন। মায়ের এই কান্না দেখে আমি বলেছিলাম, 'থাক তাহলে আমি যাব না।' জানি না, মা কেন এভাবে কেঁদেছিলেন, হয়তো তাঁর মন জানতে পেরেছিল, আর দেখা হবে না। মায়ের সেই কান্নাভেজা মুখ আজও চোখে ভাসে।" শেখ রেহানার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কথা হয় ১০ আগস্ট। রেহানার দেশে ফেরার ব্যাকুলতা দেখে তিনি বলেছিলেন, 'ঠিক আছে তোমার আসার ব্যবস্থা করছি।'

১৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সবাইকে নিয়ে ব্রাসেলসে ছিলেন রাষ্ট্রদূত কবি সানাউল হকের বাসায়। ঘুমিয়ে ছিলেন সবাই। মধ্যরাতের পর হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙে তাঁর। ফোন ছিল বসার ঘরে। তিনি শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টেলিফোনের শব্দ শুনে ভাবলেন : কেউ ধরছে না কেন? দ্বিতীয়বার রিং শুরু হলে তিনি উঠে বসলেন, নিজেই ফোনটা ধরবেন বলে। কিন্তু তার আগে কেউ ধরে ফেলায় তিনি আর ঘর থেকে বেরুলেন না। ফোন ধরেছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রদূত। কিছুক্ষণ পর আবার ফোন এলে রাষ্ট্রদূত ড. ওয়াজেদকে ডেকে ফোনে কথা বলতে রিসিভার ধরিয়ে দেন। ফোন করেছিলেন জার্মানি থেকে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তিনি

তাঁকে ঢাকার সব খবর দেন, তবে হাসিনা-রেহানাকে সব কথা বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁর নীরবতা, অস্থিরতা, বিষণ্নতা দেখে শেখ হাসিনা টের পান, নিশ্চয়ই ঢাকার কোনো খবর আছে। পরে ওয়াজেদ সাহেব তাঁদের ঢাকার সামরিক অভ্যুত্থান ও বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবর দেন।

তখন থেকে দুবোনের গলা জড়িয়ে কান্না ছাড়া আর কোনো সান্ত্বনা ছিল না। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তাঁদের প্যারিসে অথবা জার্মানিতে নিজের বাসায় নেবার চেষ্টা চালান। প্যারিস দূতাবাসের ফতেহ সাহেবের গাড়ি পাঠানোর কথা থাকলেও পরে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী প্যারিস দূতাবাসের শফি সামিকে জানালেন, তিনি তাঁদের নিজের বাসায় নিয়ে রাখতে চান। রাষ্ট্রদূত সানাউল হক কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করলেন না এবং তাঁদের দ্রুত বিদায় করতে ব্যস্ত হন। অগত্যা হুমায়ুন সাহেব গাড়ি পাঠিয়ে তাঁদের জার্মানিতে এনে নিজের বাসায় আশ্রয় দেন। জার্মান সরকার তাঁর বাসায় নিরাপত্তারক্ষীও দিয়েছিল। জার্মান সরকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। খুনিরা তখন দুবোনের সন্ধানও করেছিল।

শেখ হাসিনার ধারণা ছিল বেগম মুজিব ও রাসেল বেঁচে আছেন। জার্মানি, লন্ডন, প্যারিসে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে জার্মানির ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাঁর সঙ্গে বৈঠক করলে, তিনি দিল্লি আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর ফলে দেশের খোঁজখবর রাখা এবং দেশের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটতে পারে। দিল্লিতে ড. ওয়াজেদকে ভারতের আণবিক শক্তি কমিশনে সরকারি ফেলোশিপ দেয়া হয়েছিল এবং কড়া নিরাপত্তা ছিল বাসায়।

২৫ আগস্ট শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা দিল্লি আসেন। এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে বসেই তিনি খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারেন পরিবারের কেউ আর বেঁচে নেই। মা ও রাসেলকেও মেরে ফেলায় দুবোনের শোকের কোনো শেষ ছিল না। দিল্লির ডিফেন্স কলোনির একটি বাসায় তাঁরা থাকতেন। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদের সাক্ষাৎ হয়। শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন ইন্দিরা গান্ধী। সেই সান্ত্বনা সেসময় তাঁকে অনেকখানি শক্তি জুগিয়েছিল।

শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও রাজনীতিতে আসাটা কি সঠিক হয়েছে?

শেখ হাসিনা আমার কথার উত্তর দিয়েছিলেন খুব ধীরে ধীরে। বলেছিলেন, "আমি আমার বাবার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য রাজনীতিতে এসেছি। বাংলাদেশের মানুষ ছিল তাঁর প্রিয়। এই দুঃখী-

দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাদের জীবনের মানোন্নয়ন হোক, নিজের পায়ে দাঁড়াক, মেধায় মননে বিজ্ঞানে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। বাঙালি হিসেবে তারা যেন বিশ্বের দরবারে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি তাঁর রাজনীতি দেখেছি, তাঁর জীবনসংগ্রাম দেখেছি, তাঁর আদর্শে প্রতিপালিত হয়েছি। আমাদের পরিবারটি ছিল রাজনীতিমনস্ক। আমার বাবা তাঁর স্বপ্ন-আদর্শের কথা আমাদের বলতেন। আমাদের কথাও শুনতেন। আমার মায়ের কাছে তিনি সব কথা খুলে বলতেন, তাঁর মতামত চাইতেন। আমাদের পরিবারে সবসময় একটা শান্তি, সহমর্মিতা ছিল। বাবার আদর্শের রক্ত আমাদের দেহে প্রবাহিত। আমরাই তাঁর ধারক-বাহক। সুতরাং পিতার রাজনীতি আবার ফিরিয়ে আনাটা আমি কর্তব্য মনে করেছি। বাংলার মানুষের মাঝে আমি আমার পিতা ও স্বজনদের মুখ খুঁজে পাই।"

৩৪ বছর ধরে ১৫ আগস্ট পালন করে আসছেন শেখ হাসিনা। বুকের ভেতর বেদনার অশ্রু সবসময় তাঁকে জড়িয়ে থাকে। সেই শোকাবহ ঘটনার কথা বারবার সবার মুখে শুনেছেন। নিহত হওয়ার আগে মাত্র দশবছরের ভাই রাসেল খুব কেঁদেছিল। সবার মৃতদেহ দেখেছিল। 'আমাকে হাসু আপার কাছে পাঠিয়ে দিন'—আকুতি জানিয়েছিল, তারপরও ঘাতকের হৃদয়ে কোনো করুণা হয়নি। রাসেলের জন্য তাঁর খুব কষ্ট হয়। এই নিরপরাধ শিশুটিকে রেহাই দেয়নি ঘাতকের দল।

শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের একমাত্র মেয়ে সোফিয়া। কন্যা পুতুলের তিন মেয়ে আমরীন, আলীজা, সামাত ও একমাত্র পুত্রের নাম খন্দকার জারীফ মুজিব হোসেন। এবার (২০০৯) তাঁরা সবাই ঢাকায় আছে। শেখ হাসিনা সবসময় স্বজনদের কাছে থাকতে চান। আর দেশের মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা, তাঁর অঙ্গীকার সবার ঊর্ধ্বে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, দলীয় নেত্রী হিসেবে তিনি যথেষ্ট দায়িত্বশীল।

১৯৮১ থেকে ২০০৯ এক কলঙ্কময় পথে হেঁটেছেন শেখ হাসিনা। ১৯৯৬-২০০১ (জুলাই পর্যন্ত) প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশকে একটা স্থিতিশীল ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত সবসময় চলেছে। তাঁকে হত্যা করতে পারলেই যেন গণতন্ত্র শেষ, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ মুছে ফেলা, বাঙালির স্বাধীন সত্তাকে লুপ্ত করে ফেলা। শেখ হাসিনা নিজেও সেটা ভালোভাবে জানেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনেক বড় হৃদয়ের মানুষ, প্রচণ্ড সাহস আর দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনাও তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

বিগত সাতবছর তাঁকে হত্যার নানা ষড়যন্ত্র চলেছে, রাজনীতি থেকে উৎখাতের মহাচক্রান্ত হয়েছে। ১৩টি মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে বন্দি রেখে নিঃশেষ করে দেবার অপচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে ভেঙে চুরমার করে বিজয়ী বীরের বেশে তিনি আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। শেখ হাসিনার ইচ্ছে তিনি দেশকে আবার সামনে এগিয়ে নেবেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল করবেন।

শেখ হাসিনা বলেছেন, "আগস্ট শোকের মাস। সেই রক্তাক্ত ঘটনা চোখে দেখিনি, কিন্তু তার নৃশংসতা উপলব্ধি করি। পিতা, মাতা, ভাইহারা হয়ে আমরা দুবোন সেদিন কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাইনি। বড়মেয়ে হিসেবে আমাকেই একদিকে রেহানা ও পরিবারের সবাইকে সামলাতে হয়েছে এবং অন্যদিকে শোককে শক্তি হিসেবে অর্জন করতে হয়েছে। বাংলার মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে আমার পিতার আত্মা শান্তি পাবে—এটাই আমার একমাত্র সাধনা।"

শেখ হাসিনাকে যারা চেনেন, জানেন এবং কাছে বসে কথা বলেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক, অনেকখানি দৃঢ় এবং দায়িত্বশীল। তিনি দেশ ও জাতির জন্য আত্মনিবেদিত।

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার কাছে আগস্ট মাস একটা ভারবাহী স্মৃতি। বাবা-মা, ভাইদের স্মৃতি সবসময় তাঁকে জড়িয়ে থাকে। বিশেষ করে রাসেলের কথা, মায়ের কথা মনে হলে দুচোখ জলে ভরে আসে। তাঁর প্রশ্ন : কী অপরাধ ছিল তাঁদের? তাঁরা তো রাজনীতি করতেন না, দেশ শাসন করতেন না। তাঁদের কেন হত্যা করা হয়েছিল? শিশু রাসেলের হত্যা তো অমানবিক।

শেখ রেহানা আমাকে বলেন, "আগস্ট মাস এলেই আমার মন খারাপ থাকে। কোনো কাজ করতে পারি না। এ মাসটা একটা ভারবাহী দুঃসহ স্মৃতি আমার কাছে। ৩৪ বছর পার হয়ে গেল। কী করে পার করতে পারলাম, জানি না। শুধু মনে হয়, সেদিন ঢাকায় সবার সঙ্গে থাকলে এই রক্তাক্ত স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হত না। এই নৃশংসতার কথা শুনতে হত না।"

শেখ রেহানার সেই কৈশোর-উত্তীর্ণ তরুণ মন সেদিন এই হত্যার খবর শুনে চোখের অশ্রুতে বুক ভাসিয়েছিল। দুবোনের চোখভরা অশ্রু ছাড়া আর তো কোনো সান্ত্বনা ছিল না। বেশ কয়েকমাস লেগেছে স্বাভাবিক হতে। আত্মীয়-স্বজনরা দিল্লি গিয়ে তাঁদের বেদনার সঙ্গী হয়েছেন। শেখ রেহানার সঙ্গী হয়েছেন। শেখ রেহানা তো এতিম হয়ে যান। পিতামাতা-ভাইহারা শেখ রেহানা বোনের সঙ্গে দিল্লিতে এক দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়ে জীবন কাটান।

শান্তিনিকেতনে লেখাপড়ার সুযোগ পেলেও নিরাপত্তার কারণে যেতে পারেননি। ১৯৭৭ সালে লন্ডনে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং মায়ের মনোনীত পাত্র ড. শফিক সিদ্দিকীর সঙ্গে বিয়ে হয় সেখানে। সে বিয়েতে শেখ হাসিনা একটা টিকিটের অভাবে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এ দুঃখবোধ তাঁদের দুজনেরই আছে।

শেখ রেহানা বলেন, "এখন সর্বত্র ১৫ আগস্ট শোকদিবস পালন হচ্ছে। অথচ অনেক বছর তাঁর নাম উচ্চারণ হত না পত্রপত্রিকায়। এক অলিখিত নিষেধ মেনে চলত সবাই। গোপনে-প্রকাশ্যে কেউ লিখলে ও উচ্চারণ করলে রেহাই ছিল না। কিন্তু সত্য লুকিয়ে রাখা যায় না। বিপুলভাবেই হোক আর প্রচণ্ডভাবেই হোক সত্য একদিন প্রকাশিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্বাস আমাদের আছে। গত ৩৪ বছর ধরে তো দেখছি রাজনীতির ধারা, শাসকবর্গের মনোভাব, মানুষের কথা, গত সাত বছরের ঘটনা। জাতির পিতার প্রতি মানুষের ভালোবাসা, সম্মানবোধ আমাদেরও আলোড়িত করে। কয়েকদিন আগে লন্ডনে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে যাঁরা সংবাদ পাঠাতেন, এমন কয়েকজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বিবিসি, গার্ডিয়ান বিভিন্ন পত্রিকার। আমাকে দেখে তো তাঁরা অবাক কণ্ঠে বললেন, 'তুমি শেখ মুজিবের মেয়ে!' তাদের মুখে আব্বার কথা শুনে গর্বে আমার বুক ভরে যায়। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী আছে আমাদের? আব্বা-মা ভাইদের হারিয়েছি। কিন্তু মানুষের ভালোবাসা নিয়েই যেন বেঁচে আছি। আমাদের জীবনে এটাই যথেষ্ট।"

রাজনীতিতে আসছেন না কেন জিজ্ঞেস করায় শেখ রেহানা বললেন, "পত্রিকাগুলো বানিয়ে বানিয়ে কত কথাই না লিখল। রাজনীতি করছেন আমার বড়বোন, দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি। আমাদের পরিবার থেকে একজন আছেনই, আরও একজনের প্রয়োজন নেই। আমাদের পরিবার তো রাজনৈতিক পরিবার। আমরা তো রাজনীতির মধ্যে আছি। বাংলাদেশের জনগণের সাথে আছি; সুখে-দুঃখে, দুঃসময়ে সর্বদাই তাদের সাথে আছি। মানুষের কল্যাণ হোক, সমাজের মানোন্নয়ন ঘটুক, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ হোক, বিশ্বে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এটা ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। আমাদেরও প্রত্যাশা।"

শেখ রেহানা আরও বললেন, "বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের কথা শুনছি, আমার এটা পছন্দ নয়। ভাস্কর্য নির্মিত হলে অবহেলা-অযত্নে নষ্ট হয়। তার

চেয়ে শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধের মতো ম্যুরাল তৈরি হতে পারে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, সংগ্রাম, আন্দোলনকে প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। ৭ই মার্চ ভাষণের সময় সেই আঙুল তুলে ধরাটাও কেউ তৈরি করতে পারেন।"

১৫ আগস্ট দিন ঢাকায় থাকার খুব ইচ্ছে ছিল শেখ রেহানার। কিন্তু মেয়েদের লেখাপড়া ও চাকরি সব মিলে তো আর ছুটি পাওয়া গেল না, তাই লন্ডনের বাসায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে দোয়া-দরুদ পড়বেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করে কাটাবেন, যেমনটি দীর্ঘ ৩৪ বছর কাটিয়েছেন। সবশেষে শেখ রেহানা বললেন, "দেশের মানুষের কাছে আমরা দোয়া চাই, আমাদের সন্তানরাও যেন তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে পারে। ১৫ আগস্টের শোক আমাদের সবাইকে শক্তি দিক। ঘাতকদের বুলেটে যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। আমাদের সবার জীবনে স্বস্তি আসুক। দেশে শান্তি বজায় থাক।"

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন সফল করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির স্বাধীন সত্তাকে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী সর্বদাই অবদমিত রাখার অপচেষ্টা চালিয়েছে। বাঙালির মাতৃভাষা আন্দোলন, ৬ দফার স্বাধিকার আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ—শেখ মুজিবকে এক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন 'জয় বাংলা' মন্ত্রে। দূরদর্শীসম্পন্ন আদর্শবাদী নেতা থেকে জাতির জনক হয়েছেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তাকে যারা মেনে নিতে পারেনি, তারাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেছে। বাংলার মাটি থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার ঘৃণ্য চক্রান্ত চালিয়েছে।

৩৪ বছর পর আজ আবার জাতি বেদনাবিধুর হৃদয়ে জাতীয় শোকদিবস পালনে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের স্বপ্নের দিশারী ছিলেন শেখ মুজিব। আজ তাঁর সুযোগ্য জনদরদী কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালির সকল আশা-ভরসার আশ্রয়ধারী। মানুষ বড়বেশি প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসিয়েছে।

ভোরের ডাক
১৫ আগস্ট ২০০৯

শোকাবহ বেদনাতুর সেই স্মৃতি

সামনেই শোকাবহ ১৫ আগস্ট। জাতি আবার বেদনাবিধুর হৃদয়ে এই দিনটিকে স্মরণ করবে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরের আলো যখন ফুটেছে মাত্র, একদল উচ্চাভিলাষী সেনাসদস্যের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, তিন পুত্র লে. শেখ কামাল, ক্যাপ্টেন শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল, দুই নববিবাহিতা পুত্রবধূ ক্রীড়াবিদ সুলতানা কামাল ও পারভিন জামাল, একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, বাড়ির কাজের একজন লোক এবং পুলিশকে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধুর ভগ্নীপতি কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তার দুই সন্তান বেবী ও আরিফ, নাতি সুকান্ত আবদুল্লাহ এবং ভাইয়ের ছেলে দৈনিক বাংলার বরিশাল প্রতিনিধি সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত ও বরিশালের একজন ছাত্র আবদুল নঈম খান রিন্টুও মিন্টো রোডের বাসায় ঘাতক সেনাদের হাতে নিহত হন। সেরনিয়াবাতের স্ত্রী বঙ্গবন্ধুর মেজোবোন আমেনা খাতুন গুলিবিদ্ধ হন সেদিন। চিকিৎসকরা গুলি বের না করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। গুলি নিয়েই তিনি ৩০ বছর বেঁচেছিলেন। তারপর ২০০৫ সালে মৃত্যুবরণ। ঘাতকরা এ-বাড়িতে সর্বপ্রথম আক্রমণ করে গুলিবর্ষণ শুরু করলে বঙ্গবন্ধুকে বেবী ফোন করে জানায়। গুলিবিদ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে যান পুত্রবধূ সাহানারা আবদুল্লাহ।

একই সময় বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণির ধানমণ্ডির বাড়িতে আক্রমণ করে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা আরজু মণিকেও হত্যা করে। এই স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে আরও বেঁচে আছেন শেখ মণির দুই পুত্র পরশ ও তাপস। সেদিন তাদের চাচি তাদেরকে ঘরের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলেন। শেখ ফজলুল করিম সেলিম স্ত্রীসহ এবং শেখ মারুফও তখন এ-বাড়িতে থাকতেন। শেখ মারুফ গুলিবিদ্ধদের নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যান।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাঁরা নিহত হন তাঁদের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে বনানী কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয় কোনোপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর লাশ কঠোর প্রহরায় সারারাত ৩২ নম্বরে রাখা হয়। পরদিন সকালে তাকে টুঙ্গীপাড়া নেয়া হয় হেলিকপ্টারে এবং কঠোর প্রহরায়। টুঙ্গীপাড়ায় বাড়ির মসজিদের ইমাম সাহেব মৌলভী আবদুল হালিমকে তারা দ্রুত দাফন করতে বললে তিনি তাদের জানান, তাহলে তাকে লিখে দিতে হবে এই রক্তাক্ত লাশ শহীদের। ঘাতকরা বোধহয় সেটা চায়নি। তারা তখন গোসল ও জানাজা পড়ার অনুমতি দেয়। ইমাম সাহেবকে বঙ্গবন্ধু আগেই বলে রেখেছিলেন, 'আমার জানাজা কিন্তু আপনাকে পড়াতে হবে।' এ কথাগুলো ও স্মৃতি মৌলভী আবদুল হালিম টুঙ্গীপাড়ায় আমার কাছে বলেছিলেন। পাশে রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল থেকে রিলিফের কাপড় ও ৫৭০ সাবান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গোসল করানো হয়। এসময় তাঁকে সাহায্য করেন মিস্ত্রি আলী আসগর। দুটো কবর খোঁড়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মা-বাবার কবরের পাশে। ধারণা ছিল বেগম মুজিবকেও এখানে সমাধিস্থ করা হবে। বঙ্গবন্ধুর দুই চাচি লাশ দেখার অনুমতি পান। ইমাম সাহেব দ্রুত জানাজা পড়িয়ে সেদিন লাশ দাফন করেছিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি আমাকে বলেছেন : একটা কাঠের কফিনে লাশ বয়ে আনা হয়। বরফে ঢাকা ছিল সেই পবিত্র রক্তাক্ত দেহ। পরনে শাদা পাঞ্জাবি, লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবির পকেটে চশমা ছিল।

বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফনের পর হেলিকপ্টারের বরফগুলো রক্তের দাগ মধুমতি নদীর পানিতে ধুয়ে-মুছে নিয়ে যায়। এই মধুমতি নদী ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রিয়। এ নদীর পানিতে তিনি সাঁতার কেটেছেন। এ নদীর স্রোত দেখেছেন। এ নদীর ভেজা বাতাস তাঁকে এক শুদ্ধতম আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। একজন জাতির পিতা, একজন বঙ্গবন্ধু ও একজন শেখ মুজিবুর রহমানকে জন্ম দেয় টুঙ্গীপাড়া। বাংলাদেশের মুগ্ধময় প্রকৃতিঘনিষ্ঠ এই নিভৃত গ্রাম। বাঙালির হাজার বছর স্বপ্ন সফল করতে এ গ্রামের মাটি ও মায়ের মমতা নিয়ে যে খোকার জন্ম হয়েছিল—একদিন সে হয়ে ওঠে একটি জাতির জনক। একটি রাষ্ট্রের স্থপতি। বাঙালির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠায় বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদকারী নেতা। জেল-জুলুম-মৃত্যুদণ্ড কোনোকিছুই তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। ক্ষমতা তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক ভাষণে লাখ লাখ মানুষের সামনে তিনি সদম্ভে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম

আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে যার যা-কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকার ডাক দিলেন। বাঙালি সেদিন থেকে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ হল। স্বাধীনতার জন্য গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে লড়াই করে পাকিস্তানি শাসক ও সেনাবাহিনীকে বাধ্য করেছে আত্মসমর্পণ করতে। বিশ্বে উড়িয়ে দিয়েছে তার স্বাধীনতার পতাকা।

বিশ্বজনমত ও নেতৃবৃন্দের চাপে পাকিস্তানের কারাগার থেকে বিজয়ী বীর মহামানব শেখ মুজিব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ঘাতক-দালাল, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা ১৫ আগস্ট জাতির জনক শেখ মুজিবকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ এবং বাঙালি জাতিসত্তাকে নির্মূল করার প্রয়াস চালায়। স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে। পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকারগুলো সামরিক শাসন জারি করে স্বৈরাচারী স্টাইলে দেশ শাসন করেছে এবং গণতন্ত্রকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে বিদেশে দূতাবাসে চাকরি দিয়েছে এবং রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছে। এক অলিখিত নির্দেশে মিডিয়া থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়ে যায় যেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে, বাংলার মাটিতে যে মহান নেতার নাম ভালোবাসায় লেখা হয়ে আছে তা যে কখনও মুছে ফেলা যাবে না, তা উপলব্ধি করতে পারেনি জিয়া-এরশাদ-খালেদা সরকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা জাতির পিতাকে হেয় করার ঘৃণ্য চক্রান্ত চালায়। কিন্তু বাংলার মানুষ তা হতে দেয়নি। জাতির পিতাকে তারা সম্মানে-মর্যাদায় যেমন হৃদয়ে ধারণ করেছে, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন আওয়ামী লীগ নেত্রী হয়ে। মানুষের মনে নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর তিনি ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসেন। সংবিধান থেকে ঘৃণ্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে খুনিদের বিচার শুরু করেন। কিছু বিদেশে পলাতক থাকলেও প্রধান খুনিরা ধরা পড়ে। বিদেশ থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে আনা হয়। নিম্ন আদালতে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হাইকোর্টও সে রায় বহাল রাখে। কিন্তু আপিল বিভাগে আবার এ মামলা বিলম্বিত করে দেয়া হয়। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার সরকার আবার ক্ষমতায় ফিরে আসায় মানুষ প্রত্যাশা করছে এই হত্যার বিচার এবার শেষ হয়ে যাক।

ইতোমধ্যে তত্ত্বধায়ক সরকার বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা'র মর্যাদায় সম্মানিত করেছে এবং হাইকোর্টের দেয়া একটি রায়ও বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে উল্লেখ করেছে। ইতিহাস-বিকৃতকারী চক্র এই পরাজয় মেনে নিতে পারেনি বলে আবারো নানাভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আবারো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা বলেছিল, চালের দাম কমবে তারা দুর্নীতি ও দুঃশাসনের মাধ্যমে দেশকে শুধু অন্ধকারেই ঠেলে দিয়েছে, পশ্চাৎপদ করে রেখেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর ৩৪ বছর আমরা পার হয়ে এসেছি। সেই রক্তাক্ত শোকাবহ স্মৃতি আমাদের হৃদয়কে বেদনাতুর করে তোলে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি বাংলার ঘরে ঘরে আজও সমাদৃত। তিনি আজও আমাদের কাছে উদ্দীপনী শক্তি।

ভোরের ডাক
১২ আগস্ট ২০০৯

আমার দেখা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর

অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়ে দ্যাখো বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘাতকেরা এখানেই হত্যা করেছিল। দেয়ালে রয়েছে এখনো বুলেটের ক্ষত, সিঁড়ির চাতালে ভালোবাসা ভরা বিশাল বুক নিঃসৃত রক্তের দাগ! ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল উচ্চাভিলাষী সৈন্যের হাতে নিহত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নং সড়কের বাসভবনটি এখন থেকে তাঁর স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৪ আগস্ট ১৯৯৪ এক ভাবগম্ভীর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "আমাদের পিতা ছিলেন এদেশের জনগণের প্রিয় নেতা। পরাজিত শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের সকল মূল্যবোধ ও চেতনা ধ্বংস করতে চেয়েছে। কিন্তু বাংলার মুক্তিকামী জনগণ তা হতে দেয়নি। আমাদের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি এখন থেকে হবে জনগণের সম্পদ। একে রক্ষা করা হবে আমাদের সকলের জাতীয় দায়িত্ব। এই জাদুঘর হবে এদেশের স্বাধীনতার প্রতীক। এখান থেকেই বাঙালির সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস জানতে পারবে আগামী প্রজন্ম।"

১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা তাঁর ছেলেমেয়ের হাত ধরে এ-বাড়িতে প্রবেশ করেন। নিচতলায় মাত্র দুটি শোবার ঘর ও বসার ঘর তখন তিনি তৈরি করান। পরে ধীরে ধীরে নির্মাণকাজ এগিয়ে চলে। এই সময় বঙ্গবন্ধু কয়েকদফা রাজবন্দি থাকায় তিনিই এই বাড়ি তৈরির যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেখাশোনা করতেন।

এই বাড়ি থেকেই বহুবার বঙ্গবন্ধুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রাজবন্দি করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের পুলিশ ও সৈন্যরা।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় 'আগরতলা' মামলার ফাঁসির আসামির স্থান থেকে বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন এ বাড়িতে। আবার ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে 'ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত' অবস্থান থেকেও বীরের বেশে বিশ্ববাসী তাঁকে ফিরিয়ে আনে এ

বাড়িতে। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট ভোর ৫টায় নিহত হবার সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি তাঁর এই নিজস্ব বাসভবনে বসবাস করতেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এ বাড়িটি দখল করে রেখেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বেগম মুজিবকে তাঁর ছেলেমেয়েসহ ধানমণ্ডির ১৮নং রোডের একটি বাড়িতে আটক করে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনারা দখল রাখার সময় অবাধে মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্ত্রী, তিন ছেলে ও দু পুত্রবধূসহ বাড়িতে হত্যা করে খুনি খন্দকার মোশতাক, জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সেনাবাহিনীই দখল করে রাখে। তারাও অবাধে লুটপাট করে এবং বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে নষ্ট করে দেয়।

বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর কর্তৃপক্ষ তার যে মালামালের লিস্ট তৈরি করেছিল পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি সাত্তার যখন ১৯৮১ সালের ১১ জুন শেখ হাসিনাকে এ বাড়িতে প্রবেশানুমতি দিয়ে বাড়ি হস্তান্তর করেন তখন ম্যাজিস্ট্রেটের তৈরি 'সিজার' লিস্টের সঙ্গে দেখা যায় তার অনেক তফাৎ। অনেক মালপত্রও পাওয়া যায়নি। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে অনেক জিনিস সরিয়ে নিয়েছে।

শেখ হাসিনা বাড়িটিকে এক বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে পান। ১৯৮৭ সালে এই বাড়িতে একমাস গৃহবন্দি থাকাকালে তিনি ওপরতলার ঘরগুলো আগের মতো করে গোছান। নিচতলায় তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন সভা হত। প্রতিবছর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যা দিবসে, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে—এ বাড়িতে লক্ষ মানুষের ঢল নামে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে।

ধানমণ্ডি ৩২ নং সড়ক অবশ্য পুরোনো, নতুন নম্বর ১১। অবশ্য বাংলাদেশের মানুষের মনে এই সড়ক এখনও ৩২ নম্বর সড়ক হিসেবেই অঙ্কিত রয়েছে। এই সড়কে প্রবেশ করলেই হাতের ডানদিকে আবাসিক বাড়িগুলো অবস্থিত। হাতের বাঁয়ে সবুজ গাছপালার স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা লেক রাস্তার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে। এই সড়কের চারটা বাড়ি পার হয়েই বঙ্গবন্ধুর বাড়ি 'বঙ্গবন্ধু ভবন' নামে পরিচিত। এই বাড়িটি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর'। এই জাদুঘরের প্রবেশমূল্য দুই টাকা। প্রধান ফটকে পুলিশ প্রহরা রয়েছে, সঙ্গে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত প্রহরীও রয়েছে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ রয়েছে। গাইড হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কাজ করছে।

দু টাকার একটি প্রবেশপত্র নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকলেই হাতের ডানদিকে সরুপথ। ঐ পথ বেয়ে গাড়িবারান্দায় পৌঁছলেই হাতের বাঁদিকে সিঁড়ি, ডানদিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। এখানে একটা বেদি রয়েছে। আপনার পছন্দমতো একগুচ্ছ ফুল এই বেদিতে অর্পণ করে প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারেন।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলেই আপনার আকাঙ্ক্ষিত প্রবেশদ্বার। হাতের ডানদিকের দেয়ালে জাদুঘরের নক্শা রয়েছে, যেখানে থেকে গোটা জাদুঘরের অবস্থাটা একদৃষ্টিতে আপনি অবলোকন করতে পারবেন।

প্রথম যে-ঘরটিতে প্রবেশ করলেন এ ঘরটি বঙ্গবন্ধুর বসবাস ঘর ছিল। দুপাশে অসংখ্য ছবি, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।

এই ঘরের শেষপ্রান্তে ডানদিকে কাচের দরজা। না, আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে ঐ কাচের দরজা থেকে গোটা ঘরটা দেখা যায়। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত প্রিয় লাইব্রেরি, এখানে বসে তিনি লেখাপড়া করতেন। এই ঘর থেকেই ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২২ মিনিটে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। ৬ দফা থেকে অসহযোগ আন্দোলনের সূতিকাগার এই ঘরটি। সামনে টেবিল, টেবিলের ওপর বাংলাদেশের প্রথম হাতে-লেখা সংবিধান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বুলেটবিদ্ধ বই। র‍্যাকের মাথায় বড় কোরান শরিফ। বই রাখার আলমারিতে অসংখ্য বই। এই ঘরেও রয়েছে কয়েকটি ছবি।

এরপর বাঁদিকে করিডোর রয়েছে, যেখানে ১৯৭৫ সালের আগস্ট ঘাতকের গুলিতে নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবারসহ অন্যান্য নিহতদের তৈলচিত্র।

আপনাকে এবার বাড়ির ভেতরে উঠোন ধরে যেতে হবে। পেছনে দোতলায় যাবার সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গিয়েই একটি আলমারিতে তৈজসপত্র ও অ্যাকুরিয়াম। বঙ্গবন্ধুর খাবার জন্যে ছোট্ট টেবিল। টেবিলে তাঁর ও বেগম মুজিবের ব্যবহৃত বাসন, গ্লাস ও চায়ের কাপ। পাশে একটি র‍্যাকে রাখা আছে ঐ সময়ের দু বৈয়াম আচার ও কোকাকোলার একটি বোতল। তার পাশেই কনিষ্ঠ সন্তান রাসেলের প্রিয় সাইকেলটি। এ ঘরেই রয়েছে ঐ সময়ের সিটিজেন টেলিভিশন। বঙ্গবন্ধুর গেঞ্জিপরা ঘরোয়া একটি ছবি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এ ঘর থেকেই বাঁদিকে কাচের দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘরটি দেখুন। বিছানায় সব ঐ সময়ের বালিশ, বেডকভার, একটি হাতপাখা, ব্যবহৃত জায়নামাজ। নিচে মেঝেতে বঙ্গবন্ধুর স্যান্ডেল। পাশে ছোট্ট টেবিলে

তাঁর প্রিয় পাইপস্ট্যান্ড ও তসবিহগুলো এবং টেলিফোন। এ ঘরেই হত্যা করা হয় বেগম মুজিব, জামাল, সুলতানা ও রোজী এবং রাসেলকে। মেঝেতে কাচ দিয়ে ঢাকা আছে গুলিবিদ্ধ চিহ্নগুলো। ঘরের ছাদের দিকে তাকান, ওখানে কারুর মাথার মগজের অংশ চুলসহ উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেঁথে আছে।

এরপর সামনে এগিয়ে ডানদিকের সিঁড়িঘর, আস্তে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ান একবার। অনুভব করুন—বঙ্গবন্ধুর রক্তের ঘ্রাণ, বিশাল হৃদয়ের ভালোবাসায় স্পর্শ, সেই উচ্চকণ্ঠ, সেই সাহসী নেতৃত্ব আপনাকে উজ্জীবিত করে বলবে, 'বাঙালি বীরের জাতি। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁকে পদানত করে রাখতে পারবে না।' এই সিঁড়ির দু-তিন ধাপে নেমে বঙ্গবন্ধু সেদিন দাঁড়িয়ে ঘাতকদের বলেছিলেন, 'কী চাই?' ঘাতকরা মুখ খোলেনি ভীরুতায়। কিন্তু কাপুরুষের মতো হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে একটানা গুলি করে সেই বিশাল বক্ষে—যেখানে তার স্বপ্নের সোনার বাংলা, মোট ২৬টি বুলেটবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান। গুলির শব্দ শুনে তাঁর স্ত্রী বের হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে তাঁকেও হত্যা করে। এখানে আপনার শোককে শক্তি ও ধৈর্য নিয়ে ধারণ করুন। বাংলাদেশে পতাকার নিচে সিঁড়িতে কাচ দিয়ে ঢাকা আছে বঙ্গবন্ধুর রক্তের দাগ।

পেছন হেঁটে এসে যে-ঘরটায় ঢুকবেন সেটা তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শেখ রেহানার ঘর। এ ঘরেই আছে বঙ্গবন্ধুর সেদিনের পরনের বুলেটবিদ্ধ রক্তাক্ত পাঞ্জাবি, লুঙ্গি-তোয়ালে, কালো ফ্রেমের চশমা। বেগম মুজিবের পরনের রক্তাক্ত বুলেটবিদ্ধ ব্লাউজ, শাড়ি। তার ওপর রয়েছে সেদিনের কিছু বুলেট, শেখ নাসেরের পরনের একটি রক্তাক্ত পাঞ্জাবি। আরও আছে শেখ কামালের মুক্তিযোদ্ধা বেশের পোশাক, জামালের আর্মি ট্রেনিং পোশাক, রাসেলের প্রিন্স স্যুট। একপাশে ঝোলানো রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত চাদর, বিখ্যাত মুজিব-কোট, মোজা, জুতা, বেগম মুজিবের কাপড়, হাতব্যাগ, পানের বাটা, সুলতানা ও রোজীর শাড়ি ইত্যাদি। এ ঘরে বঙ্গবন্ধুর মা-বাবা, বোন-ভাই, স্ত্রী-কন্যা, পুত্র নাতি-নাতনিসহ বহু পারিবারিক ছবি রয়েছে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পর বেগম মুজিবের সঙ্গে পুনর্মিলনের সেই দুর্লভ ছবিটিও আপনার চোখে পড়বে। এই ঘরেই রয়েছে স্ত্রীকে লেখা বঙ্গবন্ধুর ১৩/৮/৪৪, ১৯৫২, ১৯৫৯, ১৯৬২ সালের চিঠির অংশবিশেষ। বঙ্গবন্ধুকে লেখা টুঙ্গিপাড়া থেকে পিতা শেখ লুৎফর রহমানের একটি চিঠিও। স্ত্রীকে লেখা জেলখানার চিঠিতে সেন্সর করে কাঁচি দিয়ে কাঁটা। খামের উপরও সে সেন্সরের সিল। এসব চিঠি লেখার পর এক থেকে তিন পর্যন্ত সেন্সর চলত।

এরপর সামনের খোলা বারান্দা, বামদিকে ঘুরে গিয়েও আপনি বেডরুমে দেখতে পাবেন সেই ড্রেসিং টেবিল, লেখার টেবিল, যার ওপর প্রয়োজনীয় নোটবুক, কলম। এই বারান্দা থেকে দেখা যায় সামনের রাস্তা। ১৯৬৯ সালের সেই গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত এ বাড়িতে প্রতিদিন যে অসংখ্য মিছিল আসত বঙ্গবন্ধু ওই বারান্দা থেকে দেখতেন, সামনে নিচু গাড়িবারান্দার ছাদে নেমে গিয়ে জনগণকে অভিবাদন জানাতেন। এই বারান্দায় রাখা মন্তব্য-বইটিতে আপনি কিছু লিখে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন। তারপর সামনের লোহার সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যেতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, শুক্রবার শিশুদের জন্যে খোলা থাকে। প্রতি বুধবার জাদুঘর বন্ধ। এই জাদুঘর থেকে আপনি সংগ্রহে রাখার জন্যে বঙ্গবন্ধুর বড় ছবির পোস্টার, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং 'বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের' প্রকাশিত অন্যান্য বই পাবেন।

এই বাড়ির গেট দিয়ে বের হবার মুহূর্তে আপনার হৃদয়ের উষ্ণতায়, আপনি নিশ্চয় আজ ভাবাবেগে আপ্লুত। আপনি আবার আসবেন, প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে আপনাকে বারবার আসতেই হবে এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে। এই বাড়ির ছায়ায় রয়েছে আমাদের প্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আদর্শ জীবন, দুঃসাহসী চেতনা আর সেই বিশাল বক্ষের উজাড় করে দেয়া ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত করবে বাঙালিকে আবারও নতুনতর শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাহসী চেতনায় এবং পরম ভালোবাসায়।

১৯৯৪

Northern University NUB Library Bangladesh

বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। তৎকালীন ব্রিটিশ আমলের গোপালগঞ্জ থানার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষরা বাগদাদ থেকে এসে প্রথমে বসতি গড়েন চট্টগ্রাম শহরে। কেননা বণিক হিসেবে তাঁদের পরিচিতি ছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণবঙ্গের জলাভূমিতে কৃষিজাত ফসল উৎপাদন সুবিধাজনক মনে করে তাঁরা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। ১৮৫৪ সালে সেই দিল্লি থেকে কারিগর এনে টুঙ্গিপাড়ায় শৌখিন দালানবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন, যার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই শেখ-বংশের প্রধান পেশা ছিল কৃষি-উৎপাদন ও ব্যবসা। তাঁরা ঐ সময়ে কোলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে খাদ্যশস্যের ব্যবসা করতেন। তাঁদের জমিদার ছিলেন রানী রাসমণি।

শেখ-বংশের জীবন-আচরণ অত্যন্ত সরল-সাধারণ ছিল। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও ফারসি বাংলা ইংরেজি চর্চা ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য। সামাজিকভাবে নেতৃত্বদান এবং জনগণের মাঝে বসবাস করে তাদের কল্যাণমুখী উন্নয়ন সাধন করা। শেখবাড়ির কৃষিজমিতে যেসব কৃষক কাজ করত তারা অধিকাংশই হিন্দু ও নিম্নবর্ণের হলেও শেখ-বংশের উদার মানবিক হৃদয়ের কারণে তারা সন্তানতুল্য হিসেবে পরিচিত হতেন। এখানকার কৃষি-ফসল উন্নত ছিল, দুধ-মাখন সবই কোলকাতায় দিনে দিনেও পাঠানো সম্ভব ছিল। আবার খুলনা-যশোর-বেনাপল ট্রেন-যাতায়াতও ছিল সুবিধাজনক। তবে নৌপথই ছিল একমাত্র পরিবহন। পাটগাতিতে প্রতি সপ্তাহে বিরাট হাট বসত। আশপাশের সব গ্রামের উৎপন্ন ফসল এখানে আসত। পাটগাতি নদীর ঘাটে বড় বড় নৌকা এসে ভিড় জমাত। এই হাটের পরিচিতি এত বিস্তৃত ছিল যে, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী, ঢাকা-চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী বণিকরাও এসে কেনাকাটা করতেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক সম্পদ রয়েছে এই টুঙ্গিপাড়ায়। শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব জীবনের ভিত গড়ে তুলে পরিপুষ্ট করে এই প্রকৃতি।

গ্রামের বাড়িতে তাঁর গৃহশিক্ষকের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা হয়। এছাড়া ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, অঙ্ক পড়ানোরও গৃহশিক্ষক ছিলেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়-আশ্রিত প্রায় তেরো-চৌদ্দ জন ভাইবোন তারা একত্রে মানুষ হয়েছিলেন।

শেখ মুজিবের ডাক নাম মজিবুর, মা-বাবা ডাকতেন খোকা বলে, অন্যান্যরা মিয়াভাই বলে। বাড়ির গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া মাত্র চারবছর বয়স থেকে শুরু হয়। সাতবছর বয়সে তিনি বাড়ির কাছে নিমাডাঙ্গা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

পিতা শেখ লুৎফর পেশকার হিসেবে রাজবাড়ি, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ কোর্টে চাকরি করতেন। ছুটিতে তিনি বাড়ি এলে খোকা তাঁর কাছছাড়া হতেন না, শহরের গল্প শুনতেন। শৈশব থেকেই খোকা গ্রামের মাঠে সঙ্গীসাথী নিয়ে ফুটবল খেলতেন, সাঁতার কাটতেন, ঘুড়ি ওড়াতেন, মাছ ধরতেন। গ্রামীণজীবনের সব মাধুর্য শৈশব-কৈশোর থেকে তাঁকে এক সারল্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।

শেখ লুৎফর রহমান মাদারীপুর কোর্টে চাকরি করতেন। পরে তিনি গোপালগঞ্জ শহরে এসে বসবাস করেন। তখন শেখ মুজিব প্রথমে গোপালগঞ্জ স্কুলে এবং পরে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। শহরের ব্যাংকপাড়ায় ছিল তাঁদের বাড়ি, যা এখনও রয়েছে। এই স্কুলে পড়ার সময় তাঁর চোখের চিকিৎসার জন্য তিনি পিতার সঙ্গে কোলকাতা যান। সেই তাঁর প্রথম কোলকাতা-ভ্রমণ। চোখের অপারেশনের কারণে প্রায় চার বছর পড়াশুনা বন্ধ থাকে। এরপর তিনি আবার নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করেন। ঐ সময়ে তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন হামিদ মাস্টার—যিনি গান্ধিজির ভক্ত ছিলেন, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে জড়িতও ছিলেন।—তাঁর কাছেই শেখ মুজিবুর রাজনীতির কথা শুনতেন।

গোপালগঞ্জ শহরও ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তৎপর। ব্রিটিশ শাসকদের ঘোড়সওয়ার ইংরেজি সেপাইরাও টহল দিয়ে বেড়াত।

স্কুলে যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র, একবার অবিভক্ত বাংলার গভর্নর শেরে বাংলা ফজলুল হক এসেছিলেন। স্কুলে হোস্টেলের ছাদ থেকে পানি পড়া বন্ধ করার দাবি জানিয়ে তিনি স্কুলছাত্রদের নিয়ে বিক্ষোভ করেছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে ফজলুল হক মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঐ আমলের এন্ট্রাস পাস করার পর শেখ মুজিবুর কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন।

স্কুলজীবন থেকেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। এরপর কোলকাতায় গিয়ে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন।

কোলকাতায় হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনেও জড়িত হন। ঐ সময়ে তিনি ফজলুল হকের সংস্পর্শ ছাড়াও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় জড়িত হন।

১৯৪৭ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ঢাকায় ফিরে তিনি যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এ সময়ে ভাষার প্রশ্নে ঢাকার ছাত্রসমাজ আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ মুজিবও এ-আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের নেতাও ছিলেন। ভাষার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট চলাকালে পিকেটিং করার সময় তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তিলাভ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করায় তাঁকে জরিমানা ও বহিষ্কার করেছিল।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি একটি ভুখামিছিলে নেতৃত্ব দান করায় তাঁকে গ্রেফতার করে দুবছর জেলে রাখা হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলন চলাকালে তিনি একটানা ১৭ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। ঐ সময়ে তাঁর নির্দেশে ছাত্রলীগ কর্মীরা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। অনশনের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হলে তাঁকে ফরিদপুরে নেয়া হয় এবং তিনি সেখান থেকে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন, মাওলানা ভাসানী সভাপতি ছিলেন।

১৯৫৪ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। এ সময় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের ২২৩টিতে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবের সাংগঠনিক তৎপরতায় ছিল তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক সচেতনতা। ফলে তিনি সংগঠনকে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে সক্ষম হন। বাংলার মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপোসহীন নিরন্তর আন্দোলন গড়ে তোলেন। একদিকে রাজপথ-জনপদে মিছিল-সমাবেশ সংগঠিত করে জনগণকে অধিকার সচেতনে উজ্জীবিত করে তোলেন, অপরদিকে করাচিতে গণপরিষদে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে বাংলার মানুষের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দাবি-

দাওয়া তুলে ধরেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'পূর্ব বাংলা' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পকিস্তান' রাখলে তিনি কঠোর সমালোচনা করে 'বাংলাদেশ' নামকরণের দাবি করেন এবং বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। শেখ মুজিবকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব বাংলার মানুষের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি উত্থাপন করলেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের প্রতি যে বঞ্চনা ও শোষণের স্টিমরোলার চালাচ্ছিল, ৬-দফা ছিল তার বিরুদ্ধে এক সাহসী সংগ্রাম। ৬-দফা দাবি পরবর্তীকালে ছাত্র-আন্দোলনের ঐতিহাসিক ১১-দফা দাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। শেখ মুজিবকে কুখ্যাত আগরতলা মামলায় জড়িয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিচার চালানো হয়। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলনের রোষানলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং মামলাও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি সংবর্ধনায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ঘোষণা করা হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিও করেছিলেন। এরপর আইয়ুব শাহির পতন হয়, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসে।

এরপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা না-দেয়া এবং তার পরিণতিতে অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, ভাষণ, ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকৃত স্বাধীনতা ঘোষণা, নয়মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় অর্জন, পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর আটক ও বিচার, মৃত্যুদণ্ড প্রদান, ১৯৭২-এর মৃত্যুদণ্ডদেশে প্রত্যাহার, মুক্তিদান ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। তারপর তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসী তৎপরতা দমন, জাতীয় ঐক্য গঠন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৯৭৫ সালে একটি জাতীয় দল গঠন করে সকল রাজনৈতিক ও পেশাজীবীর অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে যখন তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় দেশকে নিয়ে এলেন এবং জনগণের মাঝে প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, দ্রব্যমূল্য কমতে শুরু করেছে, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তখনই

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে ও ১৬ জন আত্মীয়স্বজনসহ সেনাবাহিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী একদল অফিসার হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং দেশকে ১৮ বছর ধরে স্বৈরশাসনের নিয়ন্ত্রণে রাখে। জনগণের আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসকরা কখনও বা গণতন্ত্রের মূলো সামনে ঝুলিয়ে দেখিয়েছে। ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হলেও দীর্ঘ স্বৈরশাসনের ধারাই অব্যাহত রয়েছে। সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও সংসদীয় পদ্ধতিতে দেশ চলছে না, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দেখা যাচ্ছে না, জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের পরিবর্তে সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তান। তাঁর তারুণ্যের রাজনৈতিক সচেতনতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর দেশপ্রেম ও সাহস। তাঁর সমসাময়িক নেতা এবং তাঁর ঐ সময়কার বক্তৃতাবিবৃতি এবং করাচির গণপরিষদের ভাষণগুলো পাঠ করলে দেখা যায় বাংলার স্বাধিকার, বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র্য-দুর্গতি এবং শোষণ-বঞ্চনার কথা বলিষ্ঠভাবে তাঁর মতো আর কেউ উচ্চারণ করত না। আবার দলীয় রাজনৈতিক সাংগঠনিক তৎপরতায় দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যন্ত মাটি ও মানুষের কাছাকাছি পৌছানোর দরদী নেতা একমাত্র তিনিই ছিলেন। পাকিস্তানী স্বৈর-সামরিক শাসকগোষ্ঠী তো বটেই, যেসব বাঙালি রাজনৈতিক নেতা তাদের তল্পিবাহক ও মদদপুষ্ট ছিলেন, তাদের কাছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আতঙ্ক। এর কারণ হল বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী মানসিকতা ও সাহসিকতা। তাই জেল-জুলুম, বিচার-শাস্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপবাদ ইত্যাদি কোনোকিছু দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দমানো যায়নি।

বঙ্গবন্ধুর এই সাহসার্জনের প্রধান শক্তি ছিল বাংলার জনগণ। তাঁর জীবনের শুরুটাই তো ছিল গ্রাম, গ্রামের মানুষ—একজন বিশুদ্ধ বাঙালি হিসেবে তাঁর জীবনাচরণ। আর সেইসঙ্গে দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁর যে অঙ্গীকারবদ্ধতা তা তো তিনি নিজের জীবন দিয়েই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

পঞ্চাশের দশকের তাঁর রাজনৈতিক জীবন লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক দিকদর্শন গ্রহণে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি যে ঐতিহাসিক ৬-দফা প্রদান করেন তাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার হিসেবেও আখ্যা দেয়া যায়। এই ৬-দফা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। নিজের জীবনের পানে না তাকিয়ে এই স্বাধীনতা অর্জনও করলেন।

বঙ্গবন্ধু-বিরোধীদের প্রধান সহায়ক শক্তি ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এসব বিরোধীদের মধ্যে যারা এই বাংলাদেশে তখনও এবং এখনও স্বাধীন বাংলাদেশে বসেই বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করে থাকেন, বঙ্গবন্ধুর ছিদ্রান্বেষণ করে থাকেন, কখনও তারা জনগণের উপর আস্থাশীল নন—আস্থাশীল নন বলেই সবসময় ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে একদিকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট নিয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়েছেন এবং অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে দেশকে এক অরাজনৈতিক ও অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন।

বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন কোনো সময়ের সীমাবদ্ধতায় নয়। বাঙালির ইতিহাস যতদিন থাকবে, বাংলাদেশের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, বাঙালির জাতীয় পরিচয় যতদিন থাকবে এবং মানবজাতির সভ্যতা ও সংগ্রামের ইতিহাস যতদিন পর্যন্ত লিখিত হবে; বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অবশ্যই সগৌরবে উচ্চারিত হবে। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তিনিই বাস্তবায়িত করে গেছেন। এই মহৎ কীর্তির জন্য শুধুমাত্র ১৩০০ সালের শ্রেষ্ঠ সন্তান তো বটেই, বাঙালির শতাব্দীর-পর-শতাব্দীব্যাপী যে ইতিহাস এগিয়ে যাবে অবশ্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামী আদর্শ অনাগত বাঙালিকে উজ্জীবিত করবে।

বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের তৈরি বঙ্গবন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত

শেখ মুজিবুর রহমান (জন্ম : ১৯২১[১] সাল), বিএ
পিতা : লুৎফর রহমান, টুঙ্গীপাড়া, থানা : গোপালগঞ্জ,
ফরিদপুর এবং ঢাকা।

সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক পরিচয়

১. দায়ী ব্যক্তি[২]—দেশ ভাগের পূর্বে 'অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের' একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী এবং বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

২. দেশ ভাগের পর, দায়ী ব্যক্তি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটে[৩] জড়িত থাকার কারণে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন বিরোধীদলে যোগদান করেন এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১১.৩.৪৮ সালে ১৪৪ ধারা আদেশ ভঙ্গ করার কারণে ঢাকায় গ্রেফতার হন, তবে পরবর্তীতে মুক্তিলাভ করেন।

৩. ২৯.৪.৪৯ তারিখে দায়ী ব্যক্তি ১৮ (২) ধারা ইপিপিএসও দ্বারা গ্রেফতার হন প্রিজুডিশিয়াল কার্যকলাপের দায়ে। কারাবন্দি থাকার সময় তিনি নিরাপত্তা বন্দিদের উপর নির্যাতন ও বিনাবিচারে বন্দিত্বের বিরুদ্ধে অনশন[৪] করেন। ২৭.২.৫২ তারিখে তাঁকে দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক হন।

৪. জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালে তিনি চট্টগ্রামে একটি জনসভায় বক্তৃতাদানকালে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি নিন্দা

প্রকাশ করে বলেন, মওলানা ভাসানীকে কারাগারে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছে। তিনি বিপিসি রিপোর্টের সমালোচনাও করেন এবং করাচিতে ছাত্রদের উপর পুলিশি অ্যাকশনের নিন্দা প্রকাশ করেন।

৫. দায়ী ব্যক্তি ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে আতাউর রহমানসহ পিকিং শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন।

৬. দায়ী ব্যক্তি 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'-এ বিশেষ নেতৃত্বের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। ১.২.৫৩ তারিখে ঢাকার একটি জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্ববাংলায় 'উর্দু' বয়কট করার জন্য প্রদেশব্যাপী দাবি বা আন্দোলন দিবস পালন করা হবে। ২১.২.৫৩ তারিখ 'শহীদ দিবস' উপলক্ষে তিনি ঢাকায় একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেন। তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান, 'বাংলা' অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ না-করা পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

৭. মার্শাল স্ট্যালিনের[৫] মৃত্যুতে ঢাকায় ১০.৩.৫৩ তারিখে আয়োজিত এক শোকসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তিনি মার্শাল স্ট্যালিনের জীবন ও আদর্শের ওপর বক্তব্য রাখেন এবং শ্রোতাদের তা অনুসরণ করতে আহ্বান জানান।

৮. ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে ঐ একই মাসে অপর একটি জনসভায় দায়ী ব্যক্তি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পাসপোর্ট পদ্ধতির[৬] নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে তা বন্ধ রাখার দাবি করেন।

৯. ১৪.৩.৫৩ তারিখে দায়ী ব্যক্তি ও আরও তিনজনের বিরুদ্ধে ইবিপিএসও আইনের ৭ (১) (৩) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। কারণ হচ্ছে ১১.৩.৫৩ তারিখে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' (State Language Day) উপলক্ষে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে আয়োজিত এক সভায় ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকারি সংবাদদাতা ও পুলিশ অফিসারদের প্রবেশে অনুমতি দেয়া হয়নি। তিনি ১৭.৩.৫৩ তারিখে আত্মসমর্পণ করেন এবং সেদিনই জামিনে মুক্তিলাভ করেন।

১০. জুলাই ১৯৫৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম বার্ষিক কাউন্সিল সভায় দায়ী ব্যক্তি পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১১. ১৯৫৪ সালে দায়ী ব্যক্তি যুক্তফ্রন্টের টিকিটে গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন এবং ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার সদস্য হন, যদিও ৩০.৫.৫৪ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার তা বাতিল করে দেয়। তাঁকে মন্ত্রিত্ব বাতিলের রাতেই গ্রেফতার করা হয়। এর কারণ হচ্ছে তিনি কেন্দ্রীয় কারাগারের ওয়ার্ডারদের উপর হামলার জন্য একটি বিশৃঙ্খল জনতাকে উত্তেজিত করে তোলেন এবং এপ্রিল ১৯৫৪ সালে কারাগারের ব্যারাক ভেঙে ফেলেন।
তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান পেনাল কোডের (পিপিসি) ১৪৭/৪৪৭/৪২৭/৩২৬/৩৩২/৩৫৩/১০৯/১৪৯ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বিচারের জন্য কোর্টে পাঠানো হয়েছে। তিনি কোর্ট থেকে মুক্তিলাভ করলেও তাঁকে আবারও ১৬.৬.৫৪ তারিখে ইপিপিএস আদেশের ৪১ (১) ধারায় গ্রেফতার করা হয়। অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য তাঁকে কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে মুক্তি দেয়া হয়।

১২. ১৯৫৪ সালে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে 'মে দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণদানকালে মে দিবসের উদ্‌যাপনের ওপর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং ১৮৮৬ সালে শিকাগোর শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মতো শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলন করে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান। তিনি ১৯৫২ সালে পিকিং শান্তি সম্মেলনের স্মৃতি স্মরণ করে পার্থক্য তুলে ধরে বলেন, চীনা শ্রমিকরা নানা সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকে আর এই প্রদেশের শ্রমিকরা দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

১৩. ১৭.০২.৫৫ তারিখে যুক্তফ্রন্টের দলীয় সভায় এ. কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনায় দায়ী ব্যক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

১৪. জুন ১৯৫৫ সালে তিনি পূর্ববাংলা গণপরিষদ ইপিএএম লীগের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ মাসের শেষে তিনি ইপাআএম লীগের সংসদীয় দলের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৫. ১৯.৮.৫৫ তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের (মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা) পূর্বপুরুষদের কথা উল্লেখ করে বিদ্রূপ করে বলেন, যারা ইতিহাস পড়েন তারা তার সম্পর্কে জানেন যে তিনি কোন্ রাজবংশ (রয়্যাল স্টক) থেকে এসেছেন এবং এ সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সকল ক্ষেত্রে সমতা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং যৌথ আইনসভা পদ্ধতি দাবি করেন।

১৬. অক্টোবর ১৯৫৫ সালে দায়ী ব্যক্তি এক বিবৃতিতে তাঁকে সহ আওয়ামী নেতৃবৃন্দের গতিবিধি দেখার জন্য আইবি ও ডিআইবি নিয়োগের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

১৭. ২৯.১.৫৬ তারিখে ঢাকার পুরানা পল্টনে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতাদানকালে একপর্যায়ে বলেন, যদি সংবিধান পাস হয়ে যায় তাহলে পূর্ববাংলাকে কলোনি করা হবে। নারী ও পুরুষদের উলঙ্গ করে রাখা হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে সমস্যাজর্জরিত করে রাখার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হবে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা সৃষ্টি করে আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার করা হবে। আপনারা জানেন, এসব কিছুর পেছনে কোন্ ব্যক্তিবর্গ আছেন, তারা আমাদের গুলি করতে পারে, কারাগারে আটক রাখতে পারে অথবা ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে। কিন্তু আমরা কখনও পূর্ববাংলার স্বার্থকে ত্যাগ করতে পারি না। ঐ সভায় তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান অথবা গুলি করে রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির দাবিকে দমিয়ে রাখা যাবে না।

১৮. ৯ এপ্রিল ১৯৫৬ সালে স্টকহোমে (সুইডেন) অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভায় যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

১৯. মে ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকায় একটি ভুখামিছিল বের করার জন্য সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ফলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে পুলিশ গুলি ছোড়ে এবং কয়েজন মানুষ মারা যায়। তিনি তখন ঢাকায় ১৯ ও ২০ মে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সেশনে আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং এই সংগঠনের সম্পাদক হন। তিনি ২৫ মে ১৯৫৬ সালে প্রদেশব্যাপী 'খাদ্য দাবি দিবস' পালনের নির্দেশ দেন।

২০. ১৯৫৬/৫৭ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম ও শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং এসময় একটি শুভেচ্ছা সফরে চীন ভ্রমণ করেন। ৩০.৫.৫৭ তারিখে তিনি বিশেষভাবে কাজ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

২১. এপ্রিল, ১৯৫৮ সালে তিনি অসুস্থতার কারণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তবে মি. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

২২. এপ্রিল ১৯৫৮ সালে তিনি দুমাসের জন্য লিডারশিপ বিনিময় কার্যক্রমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি দেশ সফর করেন।

২৩. ৫.৬.৫৮ তারিখে মর্নিং নিউজের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মির্জা। গণতন্ত্র রক্ষা করতে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ তার অপসারণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

২৪. ১৩.৬.৫৮ তারিখে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, মুসলিম লীগের সৃষ্ট পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট মি. ইস্কান্দার মির্জা এই প্রদেশের গভর্নর থাকাকালে ৯২ (ক) ধারায় ১৫ হাজার কর্মীকে কারাগারে বন্দি করে রাখেন। তিনি আরও বলেন, কিছু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, যারা প্রধানত মোহাজের, তারা চেষ্টা করছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগ সরকারকে অপসারণের জন্য অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে এবং এর ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের সুনামহানি হবে।

২৫. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি ৪.৭.৫৮ তারিখে ১৪৪ ধারা জারি ও প্রদেশে প্রেসিডেন্টের শাসন চালুর বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের ঘোষণা দেন।

২৬. ৬.৭.৫৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি বলেন, 'মনে রাখবেন, মি. ইসকান্দার মির্জা মুর্শিদাবাদের মীরজাফর পরিবারের একজন ব্যক্তি।' তিনি আরও বলেন, 'আমার যদি অনেক টাকা থাকত আমি আপনাদের করাচি নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারতাম সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বের অর্থে কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা হয়েছে। আমরা সবকিছুতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চাই।'

২৭. আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ২৪.৭.৫৮ তারিখে মর্নিং নিউজে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে থাকে যে, তারা আমাদের প্রভু, তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমি জানি না, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আর কতদিন এই চক্রান্তের খেলা চলবে।' তিনি আরও বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংবিধানের পদ্ধতি অনুযায়ী শাসিত হতে চায়, স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে নয়।'

২৮. ১.৮.৫৮ তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'কালো আইন আবার এসেছে। এটা ১৯৫৭ সাল থেকে আসতে শুরু করেছে। ১৯৫৪ সালে পঞ্চাশ জন গণপরিষদ সদস্যকে গ্রেফতার ও কারাবন্দি করা হয়। ইসকান্দার মির্জা তখন এখানে গভর্নর ছিলেন। যদি ইসকান্দার মির্জা ধারণা করে থাকেন তিনি জননিরাপত্তা আইন বলবৎ করে আওয়ামী লীগকে সংখ্যালঘু করতে সক্ষম হবেন, তাহলে তিনি ভুল করেছেন। যখন মির্জা এখানে গভর্নর ছিলেন, দুই হাজার মানুষকে কারাগারে ঢুকিয়ে রাখেন। এখন আওয়ামী লীগের সাত হাজার কর্মী জেলে যেতে প্রস্তুত। মুসলিম লীগ তিনশত জিপ ও তিন হাজার মাইক্রোফোন ক্রয় করতে চায় নির্বাচনে প্রচারণার জন্য। কিন্তু কোথা থেকে কেমন করে তারা অস্ত্র পায়? তারা পূর্ববাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে কোনো সাহায্য করেনি। যখন তিনি করাচির আরামবাগে জনসভা করছিলেন মুসলিম লীগাররা আমাদের পাথর ছুড়ে মারে। আওয়ামী লীগ জানে কীভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়, কিন্তু এবার আমরা তাদের ক্ষমা করেছি। যদি এই একই ঘটনা ভবিষ্যতে আবার ঘটে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে সভা-সমাবেশ করতে তাদের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। মির্জার কোনো ক্ষমতাই নাই ১৯৩ ধারা জারি করা। এটা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে। জননিরাপত্তা অধ্যাদেশ অবশ্যই তুলে নিতে হবে। এবার জেলখানাও সম্প্রসারিত করতে হবে, নতুবা ভবিষ্যতে থাকার সমস্যা হবে। পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে আমরা প্রমাণ করব কীভাবে সংগ্রাম করতে হয়। কেএসপি'র মাত্র ১৪২ জন সমর্থক ছিল, এখন মির্জার ১৮ জনসহ তারা ১৬০ জন হয়েছেন।'

২৯. ২৬.৯.৫৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে 'শাহেদ আলী দিবস' (প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার) উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, মুসলিম লীগ ও কেএসপি পূর্বপাকিস্তানের স্বার্থকে করাচির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে পূর্বপাকিস্তানের জনগণকে ব্যবহার করে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের সুবিধা প্রদান করতে চায়।

৩০. একটি গোপন তদন্তের ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ১২.১০.৫৮ তারিখে গ্রেফতার হবার পূর্বে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান (বাতিল হবার পর থেকে) তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য কর্মীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দেশে সামরিক শাসন আমলে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থান গ্রহণ

করবে। কিন্তু গোপনে ফিসফিস করে জনগণকে প্রচারণার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানাতে হবে :

(১) পূর্বপাকিস্তানে পাঞ্জাবি শাসন প্রবর্তনের জন্য সামরিক শাসন জারি একটা অজুহাত মাত্র। বাংলা ভাষা শেষ হয়ে গেছে।
(২) পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তানের কলোনি করা হবে।
(৩) পূর্বপাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দেয়া হল।

দায়ী ব্যক্তি আওয়ামী লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন সদস্য এবং ভালো সংগঠক। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং জানা যায়, তাঁর উচ্চাশা ও ইগোর কারণে সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন।

ফুটনোট

১. প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবের জন্মতারিখ ১৯২০ সাল। এটা তাঁর পারিবারিকভাবে স্বীকৃত। তবে তাঁর শিক্ষাগত সার্টিফিকেটে ১৯২১ সাল দেয়া হয়।
২. দায়ী ব্যক্তি হিসেবে যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান।
৩. পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর বাংলাও ভাগ হয়। তখন পূর্ববাংলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরা আবাসন ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে যে আন্দোলন করছিলেন তাকে সমর্থন জুগিয়ে জোরদার করেছিলেন আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও কয়েকজন ছাত্রনেতা। এ আন্দোলন করার জন্য তাদের অনেককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও জরিমানা করা হয়। কেউ কেউ মুচলেকা দিয়ে আবার লেখাপড়া করলেও শেখ মুজিবুর রহমান আর কখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি।
৪. প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব এ অনশন করেছিলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। কেননা কারাগারে বন্দি অবস্থায় অনশন করলে কারাগারের বিষয় ও সমস্যা-সংক্রান্ত হতে হয়। তাই অনশন করার কথা তিনি আগেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার সময় ছাত্রনেতাদের জানিয়েছিলেন। অনশনের দুদিন আগে তাকে বন্দি অবস্থায় ফরিদপুর জেলা জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। কয়েকদিনের অনশনে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে মুক্তি দেয়া হয়।
৫. রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিনের মৃত্যুর পর মার্শাল স্ট্যালিন ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা।
৬. ভারতবর্ষ ভাগ হবার পর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দুদেশের মধ্যে লোকজনের যাতায়াতে পাসপোর্ট পদ্ধতি ছিল না।

সংবাদপত্র-সাংবাদিক ও শেখ মুজিব

একজন শেখ মুজিবুর রহমান, একজন বঙ্গবন্ধু এবং একজন জাতির জনক হয়ে ওঠার পেছনে ছিল তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা। এই প্রতিভার প্রকাশ তাঁর শৈশব-কৈশোর থেকে আমরা হতে দেখি। একটি প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল যেখানে প্রকৃতির মুগ্ধময় সম্পদ মানুষের কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল। শেখ মুজিবের শারীরিক ও মানসিক শক্তি গঠনে এই বাংলার প্রকৃতি ও দরিদ্র অসহায় মানুষের একটা বিশেষ অবদান রয়েছে। শেখ মুজিব ছিলেন বিরাট হৃদয়ের মানুষ। তাঁর ভালোবাসা ছিল বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য অবশ্যই, সেইসঙ্গে সবার প্রতি ছিল তাঁর সমান দৃষ্টিভঙ্গি। এই গুণটি শিখতে হয় না, অর্জন করতে হয়। হৃদয়ে ধারণ করতে হয়। আমরা জানি, তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি তাঁর নেতা-কর্মীদের যেমন চিনতেন, তাদের নাম মনে রাখতেন, তাদের ভালোমন্দ স্মরণে রাখতেন—তেমনি রাজনীতির বাইরের মানুষকেও চিনতেন, তাদের শ্রদ্ধা করতেন। তাদের চিন্তাভাবনা বিবেচনায় আনতেন। বিশেষ করে সরকারি আমলা, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক সবার সঙ্গে তাঁর চেনা-জানা, পরিচয় এবং কারও-কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বের পর্যায়ে উঠেছিল। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁদেরও একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। শেখ মুজিব যে বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা, স্বাধীনতার স্থপতি হয়ে উঠছেন তার পেছনে ছিল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিশাল অবদান।

চল্লিশের দশকে শেখ মুজিব যখন কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান, তখন থেকেই তিনি বাংলার ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যান। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতে রাজনীতি করার। তাই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য হিসেবে তাঁর আদর্শের ছায়ায় তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন। বিশেষ করে তরুণ নেতা হিসেবে শেখ মুজিব সবার দৃষ্টিনন্দিত হন। এই সময় থেকে সংবাদপত্র অফিসে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। কলকাতার *দৈনিক আজাদ* অফিসে সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন।

অনেক সময় মুসলিম লীগের প্রেসরিলিজ নিয়েও যেতে হত তাঁকে। একসময় তাঁর উপলব্ধিতে আসে যে, মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত *দৈনিক আজাদ* মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপকে সমর্থন করে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁরা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অর্থানুকূল্যে *দৈনিক ইত্তেহাদ* প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ। পত্রিকাটি সেই সময়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে একটি আধুনিক পত্রিকা হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্রিকা বিক্রয়ের কাজে শেখ মুজিব নিজে পরিশ্রম করেন। পত্রিকার ভালোমন্দ এবং ব্যবস্থাপনার কাজেও তিনি একজন দায়িত্বশীল পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাকিস্তান হবার পরও পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশ হত। শেখ মুজিব পত্রিকার ঢাকার অফিসে সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন এবং পূর্ববাংলায় এজেন্ট নিয়োগ করে এর ব্যাপক প্রচারের কাজ করেছেন। একসময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত বলে এই পত্রিকার পূর্ববাংলায় প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয় খাজা নাজিমউদ্দিনের সরকার।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে দলের মুখপত্র হিসেবে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* প্রকাশিত হয়। মওলানা ভাসানী ছিলেন সম্পাদক, ইয়ার মোহাম্মদ খান ছিলেন প্রকাশক, কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার সকল দায়িত্ব পালন করতেন তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। পত্রিকার অর্থসাহায্য করতেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শেখ মুজিব এই পত্রিকা বিক্রির কাজও করেছেন ঢাকায়।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পূর্বে ১৯৫৩ সালে *ইত্তেফাক* সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। আর তফাজ্জল হোসেন এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব-বাংলায় ৯২ (ক) ধারা প্রবর্তন করে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়। সেসময় *দৈনিক ইত্তেফাক*ও বন্ধ ছিল। কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তফাজ্জল হোসেন তাঁকে জানান, তিনি আর কাগজ বের করবেন না। করাচিতে একটা চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছেন। শেখ মুজিব তাঁকে সেদিন অনুরোধ করেছিলেন, আপনি যাবেন না। আপনি চলে গেলে *ইত্তেফাক* আর কেউ চালাতে পারবেন না। তফাজ্জল হোসেন পরদিন তাঁকে খবর পাঠান যে, তিনি করাচি যাচ্ছেন না।

শেখ মুজিবের সঙ্গে তফাজ্জল হোসেনের গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রথম তাঁকে শেখ মুজিবের অনুরোধে সোহরাওয়ার্দী

সেক্রেটারি নিয়োগ করে পত্রিকার প্রশাসন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের একজন পরামর্শক ছিলেন তফাজ্জল হোসেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি উত্থাপন করলে এর পক্ষে *দৈনিক ইত্তেফাক* জনমত গড়ে তুলে জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেয়।

১৯৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় এদেশের পত্রিকাগুলো একটি সাহসী ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় তার শুনানি-পর্বের কোর্ট-রিপোর্টিং ধারাবাহিকভাবে দৈনিক পত্রিকাগুলোয় ছাপা হত। একদিকে ছাত্র-গণআন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, প্রত্যাহার; আবার রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে পূর্বপাকিস্তান জুড়ে প্রতিদিন মিছিল সভা-সমাবেশ। জেনারেল আইয়ুব বাধ্য হয়ে সব দাবি মেনে নিয়েছিল। ওই সময়ে পত্রিকাগুলো সংবাদ, কলাম ও সম্পাদকীয় লিখে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্যের কথাগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরেছিল। পরবর্তীতে সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও দৈনিক পত্রিকাগুলোও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তারা শেখ মুজিবের সকল সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা, বিবৃতি ও ভাষণ ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় বড়-বড় টাইপে ছাপাত। বলা চলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে, জনমানস গড়ে তুলতে পত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বের পক্ষে পূর্ণ সমর্থন রেখেছে। মানুষকে সচেতন করে তোলার যথার্থ কাজটি তখন পত্রিকাগুলো করেছে।

শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণের পর থেকে বাঙালির স্বাধীনসত্তা প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আর কোনো প্রশ্ন তখন কেউ তোলেনি। সমগ্র জাতি হয়েছিল একাত্ম। দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় শেখ মুজিবই ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা, তাঁর নেতৃত্বই ছিল গ্রহণযোগ্য। মওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবকে পূর্ণ সমর্থনদান করেছিলেন।

২৫ মার্চ রাতের পর ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পত্রিকাগুলো পাক-সামরিক বাহিনীর নির্দেশনা মেনে প্রকাশ হত। ঐ সময় *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *দৈনিক সংবাদ* অফিস আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ পত্রিকাদুটি দীর্ঘ নয়মাস প্রকাশনা বন্ধ রেখেছিল। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আবার তারা আগের মতো সাহসী

ভূমিকা পালন করে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে 'ঐ মহামানব আসে' হিসেবে পত্রিকাগুলো আখ্যায়িত করে। শেখ মুজিব বাঙালি জাতির পিতার মর্যাদায় সংবাদপত্রে স্থান করে নিলেন। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা দেশ ছাড়িয়ে সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নেতৃত্বের কারিশমা বিশ্বনেতার সম্মানে অধিষ্ঠিত।

মাত্র সাড়ে তিন বছর প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিব দেশ শাসন করেন। তবু সেই সময় ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করালেন। তবে এজন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা ছিল, দেশের মানুষও পরিশ্রম করেছে প্রচুর। বিধ্বস্ত ব্রিজগুলো নির্মাণ, ফেরি জোগাড় করে পরিবহনব্যবস্থা উন্নত, সমুদ্রবন্দরকে স্থলমাইন মুক্ত করা, অস্ত্র সমর্পণ করানো, ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো, কৃষি উৎপাদনে উদ্যোগ গ্রহণ, প্রশাসনকে গতিশীল করা ইত্যাদি নানা কাজে সবসময় উদ্যোগী ও আন্তরিক ভূমিকা নিয়েছেন। আর এসময় থেকে কোনো কোনো পত্রিকা ও সাংবাদিক শেখ মুজিবের বিরুদ্ধাচরণ, সমালোচনামূলক লেখা শুরু করে। তারা তাঁর দেশশাসনের ন্যূনতম ভুল-ত্রুটিকে তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করেছে। পরবর্তীতে যখন বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠিত হল তখন ওই সাংবাদিকরাই শেখ মুজিবের পরামর্শক হয়ে উঠলেন। তাদের পরামর্শে দেশে মাত্র চারটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক প্রকাশনা রেখে অন্যসব কাগজ বন্ধ করে দেয়া হয়। সাংবাদিকদের সরকারি চাকরি দেয়া হয়েছিল। চাকরি না-হওয়া পর্যন্ত সবাইকে বেতন দেয়া হত। অথচ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘাতকের বুলেটে নিহত হবার পর এসব পরামর্শক সাংবাদিকরা তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়েছে। তারা জেনারেল জিয়ার পাকিস্তানি স্টাইলে দেশশাসন ও একাত্তরের ঘাতক-দালালদের প্রশ্রয়কে সমর্থন করেছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে শেখ মুজিবের একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তিনি নামে জানতেন অনেককে। এদের কাছ থেকে অনেক তথ্য ও খবর পাওয়া সম্ভব ছিল বলে কেউ কেউ খুব সহজেই সরাসরি তার কাছে পৌঁছে যেতেন। দেশে-বিদেশে যেখানে যখন সফরে গিয়েছেন একদল সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে থাকছেই। তিনি সাংবাদিকদের কাছ থেকে মতামত নিতেন। বিদেশী সাংবাদিকরা তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তাঁদের কাছে তিনি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের জন্য *লন্ডন টাইমস্* ও নিউইয়র্কের *নিউজ উইক* পত্রিকা তাঁকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' আখ্যায়িত করেছিল। এটা এক বিরল সম্মান। ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। ভোয়া ও বিবিসি'র বাংলা বিভাগ সরাসরি শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সাক্ষাৎকার ও মন্তব্য নিত।

সাংবাদিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকলেও তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখনও কিছু কিছু পত্রিকা তাঁর সমালোচনা করে খবর ও কলাম প্রকাশ করত। তবে তারা তাঁর ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা, দূরদর্শিতার প্রশংসা করতেও বাধ্য হত। তিনি সাংবাদিকদের স্বাধীনচেতা হিসেবে দেখতে চাইতেন, কিন্তু পাশাপাশি দেশ ও জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখার পরামর্শ দিতেন। তাদের বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে গঠনমূলক সমালোচনা করার আহ্বান জানাতেন। তিনি সংবাদপত্রশিল্পকে অত্যন্ত মর্যাদার আসন দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ত *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকাদুটিকে পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড় করাতে সবরকম সহযোগিতা করেছিলেন।

সংবাদপত্র-সাংবাদিক ও শেখ মুজিব একটি সুতোয় গাঁথা অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাঙালি জাতির মুক্তির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে আছে।

বাঙালি বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

২৬ মার্চ ১৯৭১ বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন সফলের দিন। বিদেশী বেনিয়ারা যুগে যুগে এই বাংলার মানুষকে শোষণ করেছে, বাংলার মাটি ও সম্পদকে লুণ্ঠন করেছে—তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করেও শত্রুমুক্ত করা যায়নি।

১৯৭১-এ বাঙালির জীবনে এসেছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই সুবর্ণ সময়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সেদিন একাত্ম হয়েছিল দখলদার পাকিস্তানি স্বৈর-সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার জীবনজয়ী মুক্তির যুদ্ধে। সেদিন বিশ্বজনমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিশ্ববাসী আমাদের সমর্থন করেছিল। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণে সেদিন বাঙালি জাতি গেরিলাযুদ্ধের চেতনায় সংগঠিত হয়েছিল, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে যার যা-কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। শুধুমাত্র একটি আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে, আর তা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। একটি নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায়, একটি প্রাণের পতাকা আকাশে ওড়ানোর প্রচণ্ডতায়, বিশ্বভুবনে বাঙালির জাতিসত্তার রক্ষায়।

বাংলার মাটি, বাংলার ফসল, বাংলার সম্পদ আর বাঙালির শ্যামল সরলতা এবং শ্রমের ওপর প্রচণ্ড লোভ ছিল বিদেশীদের। যুগে যুগে তারা এসেছে অস্ত্র হাতে, পদদলিত করেছে বাংলার মানুষকে। নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে এবং ভোগ-বিলাসিতায় এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। আর নির্যাতন নিষ্ঠুর দস্যুতার মধ্যে এদেশকে শোষণ করেছে। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতির ওপরও বারবার আঘাত হেনেছে। বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজের দেশ গড়েছে, নিজেরা বিত্তবান হয়েছে। যুগে যুগে বাঙালি তার স্বাধীন সত্ত্বার প্রতিষ্ঠায় এবং একটি নিজস্ব আবাসভূমির আকাঙ্ক্ষায় প্রতিবাদী হয়েছে, লড়াইও করেছে—কিন্তু বিদেশীদের

প্রচণ্ড বর্বরতায় জয়ী হতে পারেনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজ্যলোভী রাজা-বাদশাহ, তারপর এল ইংরেজরা। তাদের দুশো বছরের শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে শিক্ষার্জনে, রাজনীতি, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে। দুটো বিশ্বযুদ্ধ এবং বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঙালির এক বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। বাঙালির মানসচেতনায় তখন থেকেই একটি নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আর এসময় বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে আসা শেখ মুজিব এক দুর্দান্ত আকাঙ্ক্ষিত যুবক, কলকাতায় ছাত্রনেতা, রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার নিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলছেন।

ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার সময় বাংলাদেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় ধর্মের নামে; সেখানে ভাষা, জাতি ও গোষ্ঠী চেতনা ছিল না। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনা অব্যাহত রেখে তার ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার ওপর যখন আঘাত হানল তখনই রুখে দাঁড়ালেন শেখ মুজিব।

১৯৪৭ সালে কোলকাতা থেকে ঢাকায় এসে তিনি পাকিস্তানের স্বৈরাচার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলনের ভিত গড়ে তুলছেন। তিনি প্রথম বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান তাঁর জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও চেতনায়। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তিনিই প্রথম ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এ আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। তিনিই প্রথম রাজনৈতিক নেতাদের সভায় আহ্বান জানান বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার করার দাবিতে সোচ্চার হতে হবে, জনমত গড়তে হবে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়তে হবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে তখনই তিনি স্পষ্ট হয়ে ওঠেন এক প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক ভিশন হিসেবে তখন থেকে বাঙালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকেই তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করে নেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি, তাঁর পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষণ থেকে আমরা দেখতে পাই তিনি বাঙালির উপর পাকিস্তানের শোষণ ও বঞ্চনার কথা খুব স্পষ্টভাবে খুলে বলতেন। বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতেন। বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাঁকে ক্রমশ এক মহান নেতায় পরিণত করে তোলে। তাঁর সাহসী চেতনায় বাংলার মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁর সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশ-ষাট দশকে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, জনসমর্থন ক্রমশ তাঁকে শক্তিশালী করে তোলে। তিনি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২১ দফা প্রণয়নে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ২১ দফায় বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন শুরু হয় মাত্র। শেখ মুজিব তাঁর লক্ষ্যপূরণে এক ধাপ এগিয়ে যান। আর পেছন ফিরে তাকানোর তাঁর প্রয়োজন পড়েনি। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, দেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের অসততা তাঁকে একলা চলার প্রেরণা জুগিয়েছিল। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী এবং দুর্নীতিপরায়ণ প্রভাবশালী আমলাগোষ্ঠী উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার নেতা একমাত্র শেখ মুজিব। তারা তখন তাঁকে দমন করার জন্য রাজনৈতিকভাবে শুধু হয়রানিই করেনি, তাঁকে বারবার কারাগারে ঢুকিয়েছে, রাজবন্দি হিসেবে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে, এমনকি তাঁর পরিবারকেও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা করেছে।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি ঘোষণা করে তাঁর লক্ষ্যকে সকলের কাছে একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন তিনি কোথায় যেতে চান, তিনি কতদূর যেতে চান, তাঁর সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন কীভাবে করবেন। তাঁর ৬-দফা দাবিতে তিনি স্পষ্ট করে বাঙালির বাঁচার দাবিকেই মূলত ঘোষণা করেছিলেন। বাঙালির প্রকৃত মুক্তিসনদ ৬-দফা শুধু স্বীকৃতিই পায়নি, এর সমর্থনে প্রবল জনমতও গড়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণাকালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন :

"ভারতের সাথে বিগত সতেরো দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যেসব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পই দেশকে এই অস্বাভাবিক জরুরি অবস্থাতেও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে।

এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দুইটি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতাহারটির লক্ষ্য তা-ই।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আজিকার কর্ণধারদের কাছে নিম্নলিখিত ছয় দফা কর্মসূচী পেশ করছি।

প্রস্তাব-১. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি :
দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর-প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারী ধরনের। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা :
কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের কেবল মাত্র দুইটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে—যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩. মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :
মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুইটির যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে : (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪. রাজস্ব, কর বা শুল্ক-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :
ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সররকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :
(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। (খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা

অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এক্তিয়ারাধীন থাকবে। (গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মিটাবে। (ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না। (ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬. আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :
আঞ্চলিক সংগতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।"

৬-দফাতেই সেদিন বাঙালি দিকনির্দেশনা পেয়ে গিয়েছিল তাঁকে কোথায় যেতে হবে। বাঙালির একচ্ছত্র প্রাণপ্রিয় নেতা হিসেবে সেদিনই শেখ মুজিবের অভিষেক হয়ে যায়। শেখ মুজিবের আদর্শিক চেতনায় বাঙালি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেও পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে দেশদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত করে সেনাছাউনিতে বন্দি করে রাখে। শেখ মুজিব হাসিমুখেই ফাঁসিদণ্ডে যেতে সাহসী পদচারণা করেন, কিন্তু বাংলার ছাত্র-জনতা ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাকে মুক্ত করে এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর ভিত্ কাঁপিয়ে দেয়। বাঙালির সেই অর্জন, শেখ মুজিবের সেই 'বঙ্গবন্ধু' খ্যাতি অর্জন—বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এক নতুন সূর্যোদয়ের পথ যাত্রা। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিরাটত্ব থেকে বিশালত্বে এগিয়েছেন, তাঁর প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে বাংলার জনগণ।

সত্তুরের নির্বাচনে বাংলার মানুষ তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠের একমাত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলার মানুষের এই অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁর হৃদয়কে এক মানবিক ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে তোলে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণার জবাবে ৭ মার্চ তিনি সাহসীকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগাম।' তিনি বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' তবে সেই বজ্রকণ্ঠ সেদিন বাংলার পথে-প্রান্তরে, জনপদ-রাজপথে, পর্ণকুটির থেকে শহর-বন্দর, সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষকে সংগঠিত করেছে।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ সেদিন থেকে গেরিলা, সেদিন থেকে বীর বাঙালি, সেদিন থেকে মুক্তিযোদ্ধা, সেদিন থেকে আত্মত্যাগী, সেদিন থেকে যুদ্ধজয়ের নেশায় মন্ত্রপাঠ করেছে, সেদিন থেকেই শত্রুহননে হৃদয়ে আগুন জ্বেলেছে। বাঙালি বিশ্বে যে যেখানে ছিল একটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়, একটি জাতির অভিষেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। তারপরও ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তাক্ত অক্ষরে, তিন লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির আত্মত্যাগে, পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর গণহত্যা, অমানবিক পশুসুলভ নির্যাতন, লুণ্ঠনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। এর পেছনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গুরুত্বপূর্ণ লড়াই ও জীবনদান, মা-বোনের অশ্রু, বিশ্ববাসীর সমর্থন এবং মিত্রবাহিনীর অসহায়তা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। সেদিন বাঙালির জীবনে এসেছিল এক সুবর্ণ সময়, বাঙালি সেদিন মৃত্যুকে ভয় করেনি, মৃত্যুর বিনিময়ে চেয়েছিল একমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাঙালির সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হল একটি পতাকা উড়িয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির জনক হয়ে উঠলেন তাঁর অবিস্মরণীয় অবিসংবাদিত নেতৃত্বে। পাকিস্তান কারাগারের মৃত্যুদণ্ড থেকে তিনি বিজয়ী বীর হিসেবে মহামানবে অভিনন্দিত হয়ে ফিরে এলেন তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে, যার পবিত্র মাটিকে তিনি একদিন শত্রুমুক্ত করার আহ্বান দেন, সেই মাটির ছায়ায় তিনি নিশ্চিত শান্তিময় আশ্রয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হবে, বাংলার মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—পদ্মা, মেঘনা, যমুনার স্রোতোধারায় এক লাল সুতোর বীরত্বগাঁথা, এক উজ্জীবনী শক্তি যা যুগ যুগ ধরে আমাদের জাগ্রত করে রাখবে।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার

প্রকৃতি বড় প্রশান্ত এখানে। শ্রাবণের আকাশ কখনও মেঘে ভরা, কখনও সূর্যের আলো রৌদ্রছটায় চারদিক ঝলমল করছে। গাছপালার সবুজ সজীবতা চোখজুড়ে স্নিগ্ধতা আনে। মধুমতী নদী থেকে ছুটে আসে বাতাস, তাল-নারকেল পাতার শর্‌শর্ শব্দ, তমাল-হিজল-বকুল গাছের পাতায় ঝিরিঝিরি শব্দ মন ভরে দেয়। সারা দুপুর ঘুঘু ডাকে, ক্লান্তি নামে না একটুও তার।

খালপারের লতাপাতার বুনো গন্ধ মেখে মেখে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর পর্যন্ত চলে এলাম। ভেজা বাতাস ক্লান্তি মুছিয়ে দেয়। কখনও বা ঝিরঝির বৃষ্টি নামে। এই বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দটুকু বড় গভীর। আবার কখনও মৃদুমন্দ শব্দ তুলে বৃষ্টি নামে। প্রচুর পানি জমে যায় নিচু ভূমিতে। মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, গাছের সবুজ পাতাও ধুয়েমুছে যায়। মাটিতে শুষ্কতা-রুক্ষতা নেই এখানে। সবসময় ভেজা থাকে, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তার কোমলতা আরও গভীর হয়। আকাশ, মাটি, নদী, গাছপালা—এই প্রকৃতি শুধু অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। হৃদয়কে ভরপুর করে তোলে, পরিপুষ্ট করে শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে। তবে তা অর্জনের জন্য সময় লাগে, হৃদয় লাগে, হৃদয়ের তৃপ্তি লাগে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়ায় প্রকৃতি দেখে একথা মনে এসে যায়। এই প্রকৃতির কোলেই তাঁর জন্ম হয়েছিল, এই প্রকৃতির আলো-বাতাস-মাটির গন্ধ তাঁকে পরিপুষ্ট করেছিল, মাতৃভূমির প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করার ঐশ্বরিক চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল। শেখ মুজিবের জন্ম তাঁর পরিবারে ও বংশে সুখবর বয়ে এনেছিল। তাঁর বড় দু-চাচার কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর মায়ের বোনদেরও কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর পূর্বে জন্ম নেন বড় দুবোন। তাই স্বাভাবিক কারণে শেখ মুজিবের জন্ম তাঁর বংশে একটা বিরাট আনন্দ বয়ে এনেছিল। স্নেহময়ী নানা তাঁর নামকরণ করে মা সাহারা খাতুনকে (বঙ্গবন্ধুর মা) বলেছিলেন, 'মা সাহারা, তোমার ছেলের নাম রাখলাম শেখ মুজিবুর রহমান, জগৎজোড়া নাম হবে!' সেদিনের সেই ছোট্ট সবুজ গ্রামের খোকা, শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে বড় হলেন, অনেক বড় হলেন, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিলেন।

বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস ছিল বিদেশী রাজা-বাদশাহদের লুণ্ঠনের ইতিহাস। এদেশের সরল শ্যামল শ্রমজীবী মানুষকে শোষণের ইতিহাস। বাঙালির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে কলুষিত করে ভাষণের ইতিহাস। বিদেশীরা এসে নিজ নিজ ধর্ম ভাষণ ও সংস্কৃতিকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে অপসংস্কৃতির প্রবাহ বাঙালির মেধা-শ্রমশক্তিকে নির্জীব করে রাখল, দরিদ্র হিসেবে পদানত রাখল। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সংগ্রাম দানা বেঁধেছে। বাঙালি রুখে দাঁড়িয়েছিল। কখনও কখনও প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছে। হাজার বছরের বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বাধীন সত্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহসী নেতৃত্ব দিয়ে যিনি বাস্তবায়িত করে গেলেন সেই শ্রেষ্ঠতম শুদ্ধতম মহামানব শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন টুঙ্গিপাড়া নামক এই ছোট্ট সবুজ প্রকৃতির শান্ত গ্রামটিতে।

টুঙ্গিপাড়া যেতে হলে গোপালগঞ্জ শহরে ঢুকতে হয়। গোপালগঞ্জ শহরে ঢোকার মুখেই পড়বে ডানদিকে লম্বা নদী, নাম মধুমতী। এই নদীরই লম্বা পথ ধরে চলে গেছে অনেক অনেক দুরে, তবে আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা যখন পিচের রাস্তা ধরে চলে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে টুঙ্গিপাড়া পৌছাই, তখনও এই নদী সেখানে পাওয়া যায় ।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ি সবুজ প্রকৃতির মাঝে একটুকরো ছবির মতো যেন দাঁড়ানো। বাড়ির প্রবেশপথেই ডানদিকে তাঁর মাজার, পাশেই তাঁর স্নেহময়ী মা ও বাবার মাজার, যাঁদের আশীর্বাদ ও স্নেহছায়ায় তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন, আবার তাঁদের মৃত্যুর খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তিনি চলে গেলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় ৩০ জুন ১৯৭৪, বাবার মৃত্যু হয় ৩০ মার্চ ১৯৭৫। তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে। তখন তাঁর আদরের খোকা জাতির জনক শেখ মুজিব, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় ব্যস্ত। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁর মা হঠাৎ বিছানায় উঠে দুহাত তুলে মোনাজাত করেছিলেন, 'হে খোদা, আমার খোকাকে ছেড়ে আমি কী করে থাকব? তুমি তাকে আমার কাছে এনে দিও।' মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা-মমত্ব তাঁকে আজীবন এক বন্ধনে যেন ঘিরে রেখেছিল।

লন্ডন ও ম্যানিলা শহরে যেবার গিয়েছিলাম, ট্যাক্সিতে উঠলেই জিজ্ঞেস করত, 'কোন্ দেশ থেকে এসেছ?' বলতাম, 'বাংলাদেশ থেকে'। লন্ডনের ড্রাইভার বলেছিল, 'ওহ্ বাংলাদেশ, ইউ কিলড ইয়োর লিডার শেখ মুজিব।' আর ম্যানিলায় ড্রাইভার বলেছিল, 'ওহ্ বাংলাদেশ, ইউ হ্যাভ এ গ্রেট লিডার শেখ মুজিব।'

বিদেশের কাছে 'বাংলাদেশ' উচ্চারিত হয় 'শেখ মুজিব' নাম নিয়েই। ১৯৭১-এর সেই মুক্তিযুদ্ধের দিনে শেখ মুজিব নামটি সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গিয়েছিল,একটি জাতির জন্মের জন্য যিনি আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন; জেল-জুলুম-ফাঁসির হুমকি, ক্ষমতার মোহ-বিলাসী জীবনযাপন, লোভ-লালসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যিনি হাজার বছরের নির্যাতিত নিষ্পেষিত জাতিকে বিদেশী বিজাতীয় পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছিলেন। তার স্বাধীনসত্তার প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রুকে যার যা-কিছু আছে তাই নিয়ে মোকাবিলার ডাক দিয়েছিলেন। বিদেশের মাটিতে বসে কোনো বিদেশীর মুখে যখন সন্দিগ্ধ চিত্তে 'শেখ মুজিব' নামটি শুনি, বুকটা অবশ্যই গর্বে ভরে যায়; একটা পরম প্রশান্তি ও নিরাপত্তা যেন আচ্ছন্ন করে রাখে। শেখ মুজিব নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন গোটা বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করল—এই আবেগাপ্লুত করে রাখে সারাক্ষণ।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারের সামনে এসে যখনই দাঁড়াই, মনে হয় ,এই বুঝি তিনি উঠে দাঁড়ালেন; মুহূর্তে ৭ মার্চের সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হয়ে যাবে চারপাশটা। বাঁশের লাঠি, নৌকার হাল নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে, আর বঙ্গবন্ধু যেন উচ্চারণ করছেন তাঁর সেই অমর কাব্যিক ভাষণ, "রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব। বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" আবার কখনও মনে হয়, বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে গেছেন, তাঁর সেই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কৌতুকভরা দৃষ্টি নিয়ে হাসছেন, তারপর আসন উঁচিয়ে বললেন, "ভয় কী! বাঙালি বীরের জাতি। পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাদের পদানত করতে পারবে না।"

নিহত বঙ্গবন্ধু বিরাট শক্তি আমাদের, যেন এক উজ্জীবনী আদর্শে আমাদের দীক্ষিত করে আছেন। আমাদের চারপাশে তাঁর বিশালত্ব, তাঁর ব্যাপকতা, তাঁর সাহসিকতা সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর মাজারে এসে দাঁড়ালে মন প্রশান্ত হয়, হৃদয় উদার হয়, প্রসারিত হয়। আর কোনো দুঃখ নয়, শোক নয়, ক্ষোভ নয়, হতাশা নয়, ব্যর্থতাও নয়—এমন এক শক্তি উজ্জীবিত করে তোলে যা সমুখপানে এগোতে সহসী করে।

মায়ের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালোবাসা-মমত্ব। সাহারা খাতুনের আরও চার মেয়ে দুই ছেলের মধ্যে খোকার প্রতি তাঁর ছিল যেন অনন্য এক টান। খোকার প্রতি ছিল তাঁর একটু যত্ন। খোকা পাতে ভাত-মাছ ফেলে উঠে পড়লে, দুধের বাটি শেষ না করলে তাঁর চিন্তার শেষ থাকত না, দুঃখের সীমা থাকত না। তাঁর রোগা-পাতলা লম্বা শিশু-কিশোর সন্তানটি যখন বড় হয়ে বাঙালি জাতির জনক হলেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখনও তাঁর

এই চিন্তা হত, দুঃখবোধ হত। বাটি থাকত তখনও, খোকাকে একটুখানি দুধভাত খাইয়ে তৃপ্তি খুঁজে ফিরতেন। কিশোর মুজিব যখন তাঁর গোলাঘর থেকে ধান-চাল মুঠি মুঠি করে তুলে গরিব-দুঃখীদের থলি ভরে দিত, মা প্রশান্ত হতেন। স্কুলের দরিদ্র সহপাঠীদের সঙ্গে করে ঘরে ফিরে মাকে বলতেন, 'মাগো ক্ষিধা লাগছে, আমাদের ভাত দাও।' মা হাসিমুখে তাঁর আবদার মেটাতেন। জানতেন তাঁর খোকা একা খেতে পছন্দ করে না, তাই একটু বেশি করে রান্না করে রাখতে হত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গাঁয়ের বাড়িঘর পুড়িয়ে যখন তাঁর মা-বাবাকে রাস্তায় বসিয়ে রেখে গালমন্দ করে তখন তিনি খোদার কাছে শান্তি কামনায় কাঁদতেন বসে বসে।

মায়ের স্নেহ-মমতা খোকাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল, খোকা একদিন 'শেখ মুজিব' নামে বড় হয়ে উঠল। মায়ের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে দেশসেবা ও জাতীয়তাবাদের চেতনায় সাহসী সংগ্রামী করে তোলে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে দাফন করা হয়। নিরস্ত্র প্রধানমন্ত্রীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে বুলেটবিদ্ধ করার ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। যে জাতির জনক তাঁর দেশের জন্য সারাজীবন আত্মত্যাগ করে গেছেন, জেল-জুলুম-ফাঁসির রজ্জুও কখনও তাঁর সাহসিক আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র সরাতে পারেনি, তাঁকে নিহত হতে হল তাঁর আদর্শের প্রতিপক্ষ বহিঃশত্রুর দেশীয় এজেন্টদের বুলেটে। টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল, চোখ মেলেই এই মাটির ঘ্রাণ তিনি শ্বাস ভরে নিয়েছিলেন। এই প্রাকৃতিক রূপ-রস তাঁকে মদির করে তোলে, পাখির শিস তাকে ধ্বনি শেখায়, আর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তাঁকে আদর্শ বাঙালির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে গড়ে দেশ ও জাতি গঠনের দায়িত্বসচেতন করে তোলে। শেখ মুজিব তাঁর দায়িত্ববোধে সচেতন ছিলেন, আন্দোলনে-সংগ্রামে-প্রতিশ্রুতিতে দুঃসাহসী ছিলেন। টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর জন্ম-নেয়া মাটির গন্ধ তাঁকে আজও বিভোর করে রাখে, টুঙ্গিপাড়ার প্রকৃতির সেই রূপ-রস-গন্ধ তাঁকে পরম মমতায় ঘিরে রাখে। তাঁর প্রিয় দোয়েল পাখি সারাদিন শিস্ দিয়ে ধ্বনি শোনায়। আর দূরদূরান্ত থেকে কত মানুষ আসে একবার তাঁর দর্শন পেতে, একবার তাঁর ছায়ায় স্নিগ্ধ হতে, একবার তাঁর ভালোবাসায় শীতল হতে, একবার তাঁর সাহসিক আদর্শে উজ্জীবীত হতে।

টুঙ্গিপাড়া থেকে চলে আসার মুহূর্তে মাটি-ঘাস-পাতা-প্রকৃতি, মধুমতি নদী, নদীর বাতাস বুক ছুঁয়ে থাকে—ভীষণ এক মমতায় জড়িয়ে রাখে, যেন—

'স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে মাথার ভিতরে।'

বঙ্গবন্ধুর বোন শেখ আসিয়া খাতুন

২৮ জুন ২০০৭ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৪৫ মিনিটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেজোবোন শেখ আসিয়া খাতুন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। বার্ধক্য জড়িয়ে ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু প্রচণ্ড প্রাণশক্তি তাঁর ছিল। জীবনে অনেক দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, অনেক শোককে বুকের ভেতর জমিয়ে রাখতে হয়েছে, তারপরও একজন পুণ্যবতী মহিলা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন যা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারও কারও পক্ষেই তা সম্ভব হয় বলে আমরা পুণ্যবতী মহিলা হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকি।

বঙ্গবন্ধুর মা সাহারা খাতুন ও পিতা শেখ লুৎফর রহমানের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে শেখ আসিয়া খাতুন দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দুবছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। বড়বোন শেখ ফাতেমা খাতুনের বিয়ে হয় ১৬ বছর বয়সে। টুঙ্গিপাড়া থেকে বজরা নৌকায় চড়ে একদিনে পথ পাড়ি দিয়ে ভাঙ্গা থানার দত্তপাড়ায় ছিল শ্বশুরবাড়ি। এজন্য মা সাহারা খাতুন পাশের বাড়ির শেখ নুরুল হকের সঙ্গে বিয়ে দেন যাতে মেয়েকে চোখের সামনে সবসময় দেখতে পান।

শেখ নুরুল হক সরকারি চাকরি করতেন সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। বঙ্গবন্ধুর লেখা স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় তিনি কলকাতা শহরে থেকে সরকারি চাকরি করতেন। দেশভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন। বঙ্গবন্ধু কলকাতার ছাত্রজীবনে বেকার হোস্টেলে থাকলেও এই মেজোবোন ও দুলাভাই তাঁর অভিভাবক ছিলেন। পরীক্ষার সময় তিনি তাঁদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করতেন। এ সময় ফজিলাতুন্নেছা মুজিবও কলকাতায় এই বাসায় গিয়ে উঠতেন। বড়বোন ফাতেমা খাতুন মাত্র ২০ বছর বয়সে দুটি শিশুসন্তানসহ বিধবা হয়ে যান। বোনের দুর্ভাগ্যের এই বেদনা তাঁকে সারাজীবন কষ্ট দিয়েছে। ভাইবোনদের মধ্যকার ভালোবাসার বন্ধনের সম্পর্কটা আসিয়া খাতুনই ধরে রেখেছিলেন।

তাঁর শৈশবের শিক্ষাটা হয়েছিল পরিবারে, মা-বাবা ও গৃহশিক্ষকের কাছে—তাঁর মায়ের আশ্রিত আত্মীয়-স্বজন, তাঁদের ছেলেমেয়ে এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে থেকে। একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তিনি শেখ-বংশের সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না আসিয়া খাতুনের, কিন্তু জীবনের শিক্ষা তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। আর সেই শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে সন্তানদের মানুষ করেছেন। বড়ছেলে শেখ ফজলুল হক মণি ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তিনি কখনও তাকে বাধা দেননি। ছেলেদের প্রতি তাঁর একটিমাত্র প্রত্যাশা ছিল লেখাপড়া করতে হবে। মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে হবে। ভাই শেখ মুজিবের ভক্ত ছিল ছেলে। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক আদর্শের একজন যোগ্য অনুসারী ছিলেন শেখ মণি। ছেলের চিন্তাভাবনা, লেখাপড়া, কাজকর্ম এবং পরে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ—সবকিছুর পেছনে ছিল মা আসিয়া খাতুনের সযত্ন দৃষ্টি এবং নিবিড় সহযোগিতা। শেখ মণি '৬২ ও '৬৬-এর ছাত্র-আন্দোলনে একজন সংগ্রামী নেতা ছিলেন। বিশেষ করে তার সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল প্রচণ্ড।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'ছয় দফা' দাবি ঘোষণা করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে নামলে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ও পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দেয়া হয়। ওই ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছয়দফার দাবিতে হরতালের ডাক দেয়া হয়। পুলিশের গুলিতে তেজগাঁর শ্রমিক নেতা মনু মিয়াসহ অনেক মানুষ নিহত হন। রাজনৈতিক নেতারা বন্দি ছিলেন। তাই ছাত্রনেতারাই তখন আন্দোলন-সংগঠনের দায়িত্ব নেন। শেখ মণির সঙ্গে তখন প্রায় সব ছাত্রনেতাই একাত্ম ছিলেন। তিনি সকলকে সংগঠিত করেছিলেন। আইয়ুব সরকার ছাত্রলীগের সব প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করলে শেখ মণিও বন্দি হন। পরবর্তী সময়ে রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাকও রাজবন্দি হন। কিন্তু শেখ মণির সংগঠিত পথ ধরেই পরবর্তী সময়ে উনসত্তরের গণআন্দোলনে ছাত্রঐক্য গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মণি ও শেখ সেলিম দু-পুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়ে মা আসিয়া খাতুন তখন বড়বোনের কাছে ঢাকায় বসবাস করেন। একদিকে অসুস্থ মা-বাবার সেবাযত্ন, অন্যদিকে ছেলেদের জন্য গৌরববোধ করতেন যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে গেছে।

১৯৭৪ সালের ৩০ মে মা ও ১৯৭৫ সালের ৩০ মার্চ পিতা মারা যাবার পর ১৫ আগস্ট ঘাতকদের দল নৃশংসভাবে হত্যা করে পুত্র শেখ মণি ও

তাঁর সন্তানসম্ভবা পুত্রবধূ আরজু মণি এবং তাঁর আদরের ছোটভাই শেখ মুজিবের পরিবারকে। এ সময়টা তাঁর জীবনের একটা কঠিন ও কষ্টকর সময় ছিল। একদিকে ব্যক্তি-শোককে সামলানো, আবার নিহত পুত্র ও পুত্রবধূর দুই শিশুসন্তান পরশ ও তাপসকেও বুকে টেনে নিতে হয়। তাদের শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছেন—এটাকে তিনি তাঁর দায়িত্ব বলে মনে করতেন। '৭৫-এর পর তাঁর হৃদয়ের স্নেহছায়ায় গভীরভাবে আশ্রয় পান বঙ্গবন্ধুর দু-কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। এই দুই মা-বাপ-ভাইহারা মেয়েকে তিনি যেন তাঁর আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে নেন। ছোটবোন আমেনা খাতুনের স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাত নিহত হন দুই সন্তান ও এক নাতিসহ। আমেনা খাতুনের শরীরে গুলি ঢুকলেও তিনি বেঁচে যান এবং ২০০৪ সালে গুলিসহ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ও তাঁর সন্তানদের প্রতিও যত্নশীল ছিলেন। আদরের ছোটভাই আবু নাসেরও সেই রাতে ভাই শেখ মুজিবের বাড়িতে অবস্থান করায় ঘাতকরা তাঁকেও রেহাই দেয়নি। ভাইয়ের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্যও স্নেহধারা ছিল বহমান।

এতসব শোক তাঁকে মনে হয় শক্তি জুগিয়েছিল। এসব শোকার্ত পরিবার ও দুঃখভারাক্রান্তদের একজন নির্ভরযোগ্য ও শান্তিময়ী অভিভাবক ছিলেন তিনি। সবার চোখের পানি মোছাতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু নিজের চোখের পানি ঝরাতে পারেননি, তাই তাঁর বুকের ভেতরটা কষ্ট ও বেদনায় পাথর হয়েছিল। সবাইকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে হয়েছে তাঁকে এবং সবাইকে শান্ত ও আনন্দে রাখার এক মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন তিনি।

আমরা দেখেছি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং পরশ-তাপসকে কী আদরই না তিনি করতেন। তাদের আশা-ভরসার একটা আশ্রয়স্থল ছিলেন আসিয়া খাতুন। তারা দূরে থাকলেও নিয়মিত খোঁজখবর দিতে হত তাঁকে। এখন সেটা হারিয়ে গেল।

সর্বশেষ তাঁর মেজোছেলে শেখ সেলিমকে যৌথবাহিনী আটক করে নিয়ে যাবার সময় তিনি ছোটমেয়ে রেখার বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু 'সেলিম কেন আসে না কাছে' প্রশ্ন করেছেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে 'তিনি বিদেশে গেছেন জরুরি কাজে।' মায়ের মনে টানাপড়েন তো থাকবেই। তিনি দুদিন পর আবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'বিদেশে গেছে তো আমাকে একবার ফোন করল না কেন? বিদেশে গেলে তো বেশিদিন থাকে না!'

শরীরে তাঁর তেমন রোগ ছিল না। একবার প্রফেসর নুরুল ইসলাম তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি জীবনে এত কইমাছ খেয়েছেন যে আপনার

কখনও হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা নেই।' কইমাছ ছিল তাঁর খুব প্রিয়। নিজে খেতে এবং মানুষকে খাওয়াতে এত ভালোবাসতেন যে তার কোনও তুলনা ছিল না। মায়ের কাছে রান্না ও গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ড যা শিখেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে রেখেছেন, ব্যবহারও করেছেন।

পরকে আপন করার, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করার একটা আকর্ষণীয় শক্তি ছিল তাঁর। তাঁর কাছে হাত পেতে কিছু চাইলে কখনও ফিরিয়ে দেননি। ভাই ও ভাইয়ের মেয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এটাই ছিল তাঁর আনন্দ। কখনও তাঁদের কাছে কোনও চাওয়া-পাওয়ার দাবি করেননি। নিজের সন্তানদের কাছেও না। এখানেই ছিল তাঁর সৌজন্য ও বিনয়বোধ। ১৯৮৭ সালে স্বামী শেখ নূরুল হক মৃত্যুবরণ করলে তিনি গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শেখ সেলিমের কাছে এসে থাকেন।

তাঁর কথা হাসিনা ও রেহানার কাছেই বেশি শুনেছি। ড. নীলিমা ইব্রাহিমও প্রশংসা করতেন। সুফিয়া কামালও একবার বলেছিলেন, 'মুজিবের একটা বড়বোন কলকাতায় ছিল, শেখ মণির মা। খুব ভালো মহিলা। যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।'

আমিও শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রথমবার যখন যাই দূর থেকে দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু কাছে টেনে আপন করে নেয়ায় সেই দূরত্ব আর থাকেনি। তাঁর স্নেহের ছায়ায় আমারও আশ্রয় জুটেছিল। তিনি আমারও ফুপু হয়ে ওঠেন। একবার ১৫ আগস্টের নিহতদের জীবনীগ্রন্থ তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করি। শেখ ফজলুল হক মণির জন্য ফুপুকে ফোনে জিজ্ঞেস করলাম, 'মণি ভাইয়ের জীবনী তৈরির জন্য আমার কিছু তথ্য দরকার, কখন আসব।' ফুপু বললেন, 'কী তথ্য দরকার বলো, আমি বলছি তুমি লিখে নাও।' আমি জন্মতারিখ, শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তারিখসহ সব তথ্য দ্রুত দিয়ে গেলেন। আশ্চর্য হলাম তাঁর স্মরণশক্তি দেখে। মনে হয় সব তাঁর মাথায় নোটবদ্ধ করা। এরকমভাবে অনেকবার তাঁকে ফোন করে তথ্য জেনেছি। বঙ্গবন্ধুর ডায়েরির কাজ করতে বসে অনেক তথ্য ও নাম জানতে শেখ হাসিনাও তাঁর কাছ থেকে সঠিকভাবে পেয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধুর ফরিদপুর জেলে আটক, অনশন ও মুক্তির ঘটনাগুলো ফুপুর কাছে আমরা প্রথম পাই। পরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথায় ঠিক একইভাবে এই ঘটনার বিবরণ দেখেছি। প্রখর স্মরণশক্তি ছিল বলেই তিনি বংশের অনেকের নাম-পরিচয় ইত্যাদি বলে দিতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুর ছোটবোন শেখ খোদেজা হোসেন, এখন বেঁচে রইলেন।

শেখ আসিয়া খাতুন দীর্ঘজীবন পেয়েছেন। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি এবং তাদের ছেলেমেয়েকেও দেখে যেতে পেরেছেন। শেখ-পরিবারের সকলেই, আত্মীয়স্বজন, ভাই ও পুত্রদের নেতা-কর্মী সকলের প্রতিই ছিল অশেষ স্নেহ ও মমত্ব। পরকে আপন করে নেবার এই আত্মিক শক্তি তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র শেখ সেলিমকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে মাকে শেষবারের মতো দেখার, জানাজা ও দাফনকাজে অংশ নেবার সুযোগ দেয়া হল। এই বন্দি অবস্থায় মা-হারানোর ব্যথা শেখ সেলিমসহ আত্মীয়-পরিজন সকলকে বেদনাতুর করে তুলেছিল। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক। তাঁর প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিচিত্রা
৩০.০৬.২০০৭

বঙ্গবন্ধুর জামাই : ড. এম. ওয়াজেদ মিয়া

দেশের বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ড. এম. ওয়াজেদ মিয়া গত ৯ মে নানা জটিল রোগে চিকিৎসারত অবস্থায় স্কয়ার হাসপাতালে মারা যান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন ডায়াবেটিস, কিডনি ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। তাঁর চিকিৎসা হচ্ছিল দেশেই। দুবার বিদেশে গিয়েছিলেন। একবার পেসমেকার নিতে। আর একবার গত এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে। এর আগেও একবার তাঁর হাঁটুর অপারেশন হয়েছিল ঢাকায় শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত দশবছর ধরেই তিনি একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপরও স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল।

খাওয়াদাওয়া করতেন ভালো বরং নিষেধ মানতেন না। চিকিৎসকরা যেসব খাবার খেতে নিষেধ তা পছন্দ ছিল না তাঁর। প্রিয় কোনো খাবার সামনে দেখলে নিজেই তুলে খেয়ে নিতেন। বলতেন : আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে খাব, ডাক্তার বলে বলুক। ওষুধ খেতে হত অনেকগুলো। তাঁর নাতনি শামু সব গুছিয়ে দিত। সেগুলো খেতেও কার্পণ্যবোধ করতেন না। সিগারেট পছন্দ করতেন। চিকিৎসক বা বাড়ির কারও নিষেধ মানতেন না। একেবারে অটল থাকতেন তার সিগারেট চাই। কাউকে আনতে দিয়ে প্রতীক্ষায় থাকতে চাইতেন না। খুব অস্থিরবোধ করতেন। মৃত্যুর কদিন আগেও নাতনি শামুকে বলেছেন : আমি একটা সিগারেট খেলেও ভালো হয়ে যেতাম। তাঁর প্রিয় খাবারের তালিকায় মিষ্টি, মাছ-মাংস, ভর্তা ও ফল ছিল। অনেকদিন তাঁকে আচার খেতে দেখেছি। চা খেতে চাইতেন বারবার।

টেলিভিশন দেখা, খবরের কাগজ পড়া, কেউ দেখা করতে এলে গল্প করা, নিমন্ত্রণকার্ড পেলে সেখানে যাবার জন্য আগ্রহী হতেন। কয়েকটি সংগঠনের উপদেষ্টা ও সভাপতি ছিলেন। সুধাসদনে তাদের সঙ্গে বসে সভা করতেন। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদৎ দিবসে বত্রিশ নাম্বারে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এবং বনানী কবরস্থানেও শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের সভায় উপস্থিত হতেন

আগ্রহ নিয়ে। ঘরের ভেতরে থাকলে এবং পরিবারের সবার মাঝে থাকলে স্বস্তি পেতেন।

তাঁর স্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৭ সালের ১৫ জুলাই মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় যৌথবাহিনী দ্বারা গ্রেফতার হয়ে বিশেষ জেলে যাবার পর থেকেই তিনি একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেসময়ও তাঁকে কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি প্রথমদিকে কারাগারে বন্দি স্ত্রীকে দেখতে যাবার অনুমতিও পাননি। পরে কয়েকবার জেলে শেখ হাসিনাকে দেখতে যান। জেলবন্দি শেখ হাসিনার মুক্তির জন্যও সরকারের কাছে আবেদন করেন। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনাকে বিদেশ পাঠাতেও তিনি আবেদন করেছিলেন। তিনি আবেগতাড়িত মানুষ ছিলেন বটে, তবে প্রয়োজনে যে দায়িত্বশীল হতে পারেন সেটা তখন আমরা লক্ষ্য করেছি।

ড. ওয়াজেদ মিয়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় জামাতা ছিলেন। ১৯৬৭ সালে বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা মামলার রাষ্ট্রদোহী আসামি হিসেবে কারাবন্দি, ১৭ নভেম্বর শবেবরাতের রাতে শেখ হাসিনার সঙ্গে ড. ওয়াজেদের আকদ সম্পন্ন হয়। পারিবারিকভাবে আত্মীস্বজনরাই এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ বিয়ের উদ্যোক্তা ছিলে রংপুরের আওয়ামী লীগ নেতা মতিউর রহমান। তিনি বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিয়ের প্রস্তাব দেন। শেখ হাসিনা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের (অনার্স) প্রথম বর্ষের ছাত্রী এবং ড. ওয়াজেদ মিয়া ঢাকায় আণবিক শক্তি কমিশনের সাইন্টিফিক অফিসার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স ও এমএসসি পাস করে ইটালি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আণবিক কমিশনে যোগদান করেন। মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারক এই পাত্রকে বেগম মুজিব খুব দ্রুতই পছন্দ করে ফেললেন ঠিকই, কিন্তু কারাবন্দি স্বামী শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অনুমতি নিয়েছিলেন। শেখ মুজিব শুধু বলেছিলেন, 'হাসুকে একবার জিজ্ঞেস করে নিও।'

ঐসময় বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার অভিযান আনা হবে—এসব কথা বাইরে শোনা যাচ্ছিল। বাড়িতে একজন দায়িত্বশীল কোনো পুরুষ অভিভাবক ছিল না। বেগম মুজিব একাই সংসার, দলীয় নেতা-কর্মী, কারাবন্দিদের স্ত্রী-সংসার এবং কারাবন্দি শেখ মুজিবের খোঁজখবর, মামলার পরিচালনার কাজ

দেখাশোনা করতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই ছোট, লেখাপড়া করে। বাড়ির বড় জামাই পাশে থাকলে তিনি কিছুটা সাহায্য পাবেন। আর তিনি নিজেও চেয়েছিলেন মেয়ের জন্য একজন মেধাবী পাত্র। সুতরাং খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই বিয়ে হয়ে যায় খুব সাদামাটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে। পরবর্তীতে বঙ্গবঙ্গু মুক্তিলাভ করলে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. আজিজ চট্টগ্রামে একটি বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।

বিয়ের পর ওয়াজেদ সাহেব বত্রিশ নাম্বারে থেকে তাঁর সরকারি চাকুরি করতেন। রাজনীতি তো ছাত্রজীবন থেকেই করতেন। তাই দেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক পরিবারে বিয়ে করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে এমন সাহস কতজনের ছিল? তাও সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে। শেখ মুজিব তো জে. আইয়ুব খান শুধু নয়, পাকিস্তানে শাসক ও রাজনীতিবিদদের কাছে বিরাট আতঙ্কস্বরূপ ছিলেন। আগরতলা মামলা দায়ের হবার পর প্রথম তিনমাস শেখ মুজিবের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ক্যান্টনমেন্টে সেনাদের মেসে বড় দুঃসহ অবস্থায় তাঁর জীবন কেটেছে। একসময় তাঁকে হত্যা করারও আশঙ্কা ছিল। সেসময় বেগম মুজিবকেও জিজ্ঞাসাবাদ করত সেনা-গোয়েন্দারা। এই বাড়ি ও বাড়ির লোকজনের ওপর কড়া নজরদারি ছিল। সেসময় বেগম মুজিবের পাশে শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ ছিলেন। দু-চারজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সুহৃদরা যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ড. ওয়াজেদ মিয়া একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছিলেন। তাঁর নিজের পেশাগত ক্ষেত্র নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। তিনি গবেষণার কাজ করেছেন দেশে-বিদেশে, তাই এর গুরুত্বটা উপলব্ধি করেছিলেন। দেশে বিজ্ঞানের ধারা বিকাশে এবং আণবিক শক্তি কমিশনকে শক্তিশালী করে এর ব্যাপক বিস্তারের মাধ্যমে মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের কথা ভাবতেন। এখন যে যাই বলুক, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ধারা বিকাশে তাঁর সহযোগিতাকে কতখানি মূল্যায়ন করেছেন সেটা জানা যাবে একদিন। তাঁর মতো একজন বিজ্ঞান-মেধাবী মানুষের মৃত্যুর পর আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা ও বিকাশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ আজ আরও বেশি করে অনুভূত হবে।

ড. ওয়াজেদ মিয়া জ্ঞানের সাধনা ও নিজের পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতিকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। তার উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ভুক্তভোগী হন, এবং প্রয়োজনীয় সময়ে দায়িত্ববান ছিলেন। ১৯৭১

সালে পাকসেনাদের অস্ত্রপ্রহরায় বঙ্গবন্ধু-পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর প্রথম সন্তান জয়ের তখন জন্ম হয়। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই মেধাবীজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মর্যাদাহানি করে সরকারি চাকুরিচ্যুত করার সাহস পায়নি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর রাষ্ট্রদূত প্রথম তাঁকেই খবরটি দিয়েছিল।

মানুষ জন্ম নেয়, শিক্ষার্জন করে, জীবনযাপন করে, তারপর একদিন চলে যায় এই পৃথিবী ত্যাগ করে। ড. ওয়াজেদ মিয়া রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ফতেহপুর থেকে ঢাকায় এসে প্রতিষ্ঠিত হন তাঁর শিক্ষাসাধনা ও পেশার সচ্ছলতায়। সুধাসদন তিনি নিজের পরিকল্পনাম স্থপতির সাহায্যে গড়ে তোলেন। এ বাড়িটি লেকঘেঁষা এবং তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এ বাড়িতে একটি পেরেক পোঁতা হলে তিনি কষ্ট পেতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু-কন্যা তাঁর স্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যখন মানুষের ভিড় লেগে থাকত তিনি নীরবে তা দেখতেন, উপভোগ করতেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষের ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ড. ওয়াজেদ মিয়া তাঁর প্রিয় জন্মভূমির মাটিতেই শায়িত হলেন। এটাই তাঁর শেষ দাবি ছিল ফতেহপুরে মায়ের কবরের পাশে যেন সমাধিস্থ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু-পরিবারের একজন সদস্য চলে গেলেন। এই পরিবারের জামাই হিসেবে সবার কাছে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ছিল। পরিবারের বাইরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর কাছেও তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবেও আণবিক বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের কাছে তাঁর সমাদর ছিল। দেশে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা তাঁকে একজন নিভৃতচারী ও জ্ঞানী মানুষ হিসাবে সম্মান করতেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। সেই শোক ও বেদনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজও হৃদয়ে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। অনেক কঙ্করময় পথ তাঁকে হাঁটতে হয়েছে, অনেক কঠিন সময় পার করতে হয়েছে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় রক্তাক্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে আজ তিনি অনেক বেশি স্বাভাবিক, প্রত্যয়ী, দৃঢ় ও শক্তিশালী।

শেখ হাসিনার মাথার উপর ড. ওয়াজেদ মিয়া তবু তো একটা আশ্রয় ছিল—আজ সেটাও সরে গেল। দীর্ঘ ৪২ বছর দাম্পত্যজীবন—এক বিশাল স্মৃতি। অনেক সুখ-দুঃখের, জীবনযাপন জাতির কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে। শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানেরা এই শোককে জয় করবেন, শক্তিশালী হবেন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবেন এই প্রত্যাশা এখন আমাদের।

ড. ওয়াজেদ মিয়ার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

১২.০৫.২০০৯

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ছবি

অসুস্থ স্বামীর কপালে স্ত্রীর হাতের পরশ

পরিবারের সকলের সাথে খাবারের টেবিলে

৩২ নম্বর বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

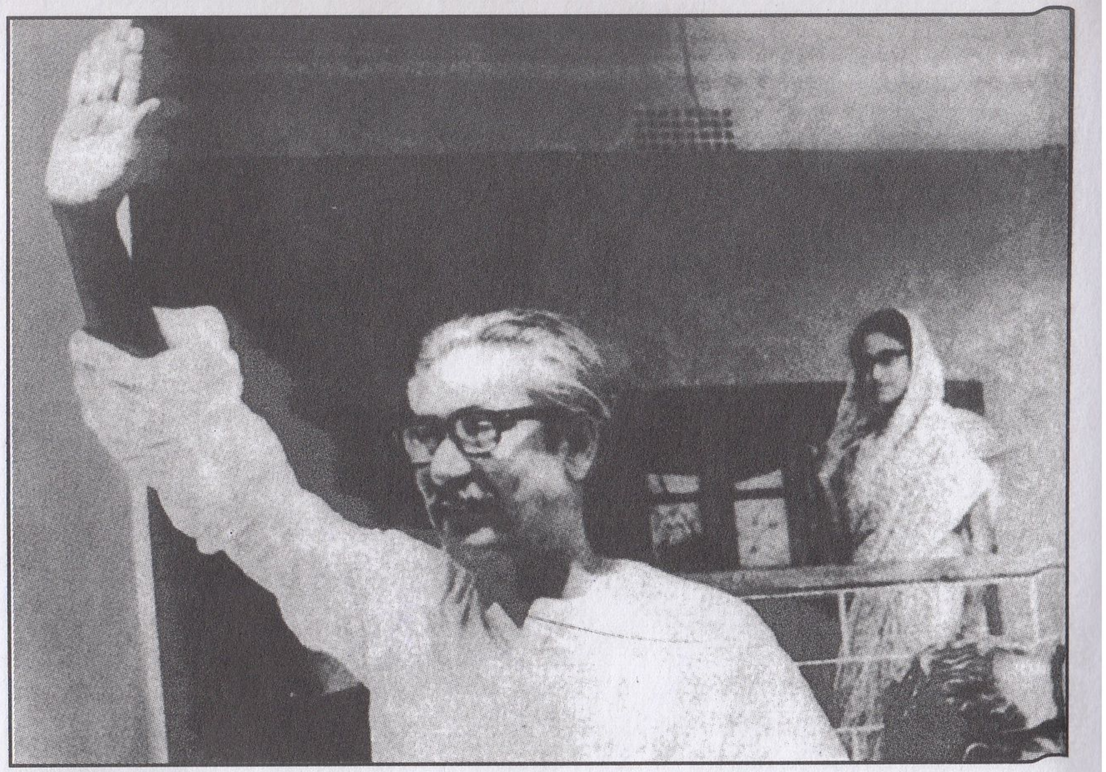

নিজ বাড়ির দোতলা থেকে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন, পেছনে শেখ হাসিনা

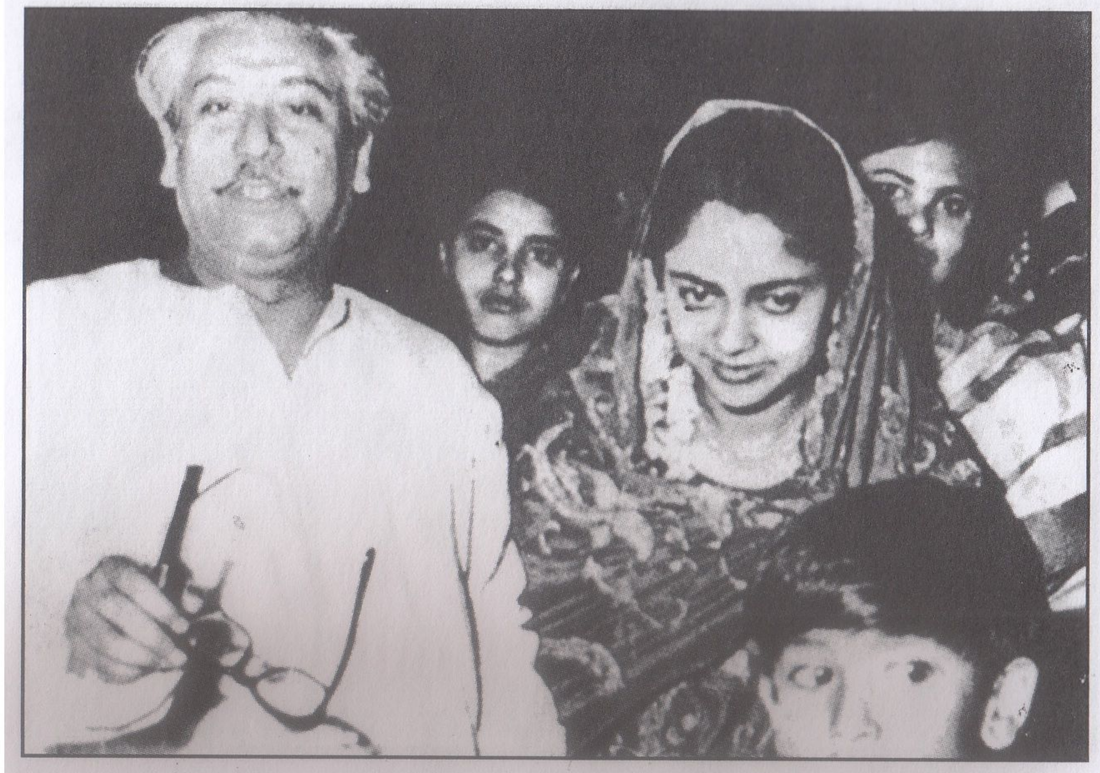

বঙ্গবন্ধু বড় পুত্রবধু সুলতানা কামালকে বরণ করছেন

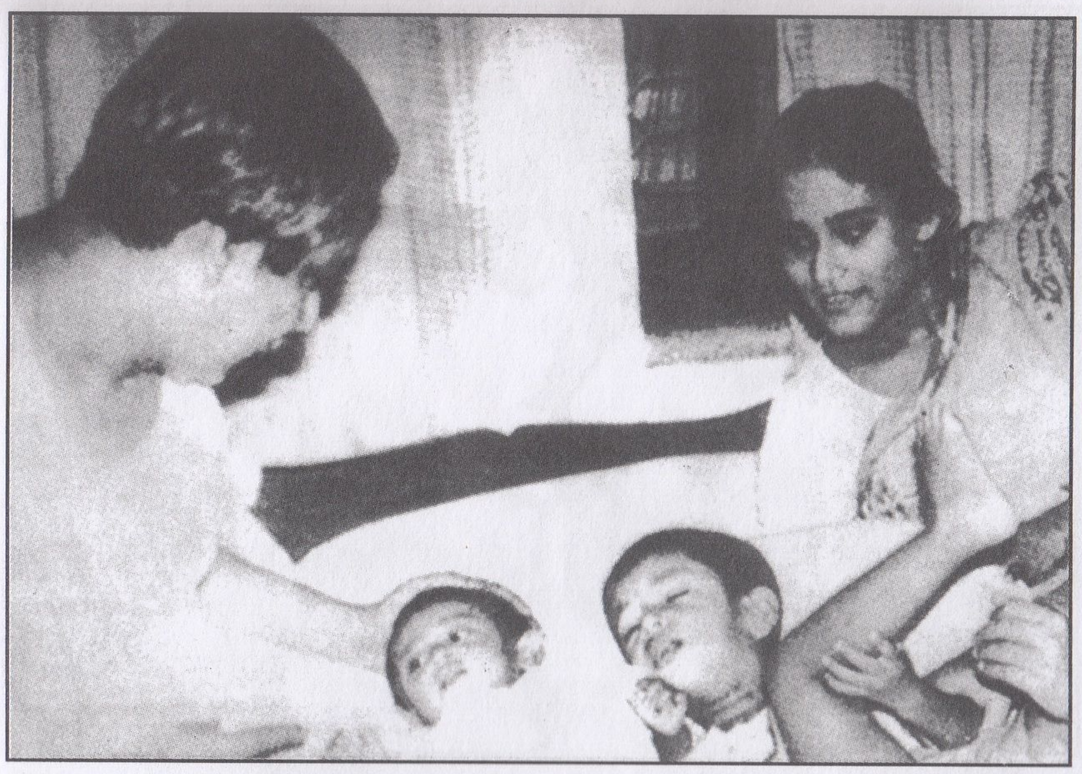

নাতী-নাতনী ও শেখ হাসিনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

বাবা মার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

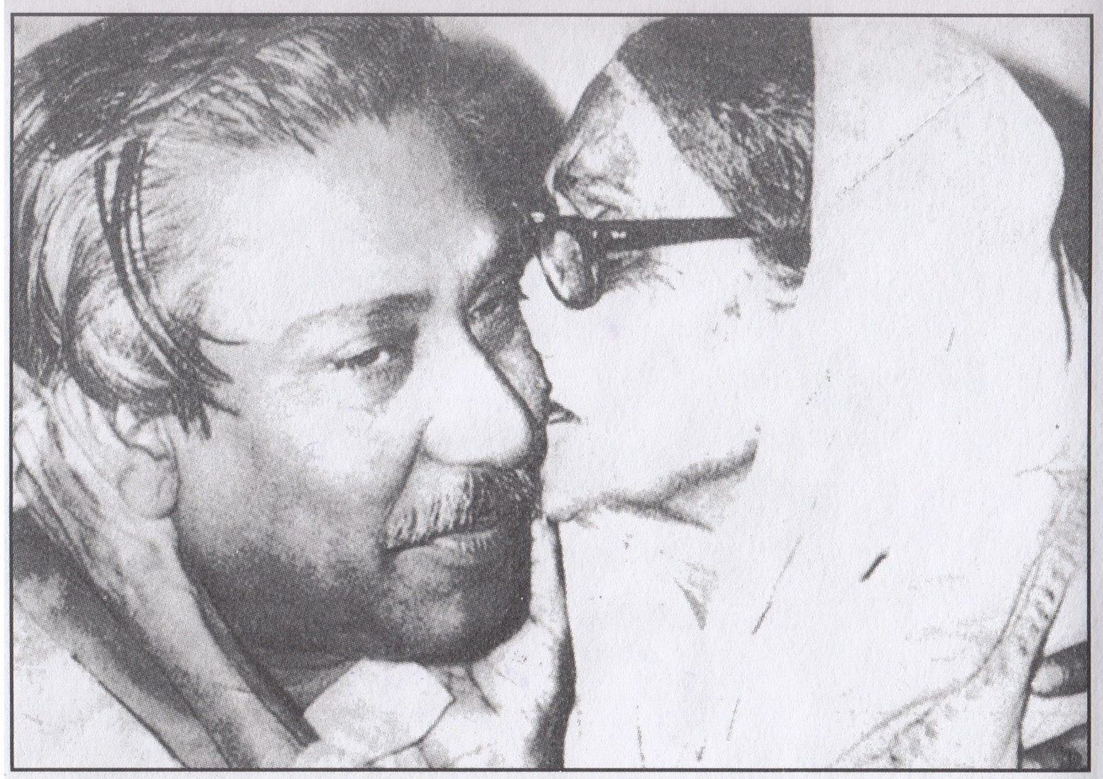

স্নেহশীলা মা আদর করছেন তাঁর প্রিয় সন্তান মুজিবকে

বাবা-মা ও স্ত্রীর সঙ্গে

পরিবারের সকলের সাথে